thereport24.com

সূচি

সূর্যসন্তানদের রক্তে বার বার ভিজেছে দেশ ২-৪
বারবার কাঁটা ছেড়া: ৪৭ বছরেও হয়নি কাঙ্খিত শাসন কাঠামো ৫-৯
দলীয় সরকারের অধীনে কেমন নির্বাচন হবে?-১০
বিজয়ী হলে কে হবেন ঐক্যফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী? ১২-১৩
ভিক্ষুকদের কাছ থেকেও চাঁদা নেয় সংঙ্ঘবদ্ধ চক্র ১৫-১৭
ইউটিউবের পেটে গান-নাটক-সিনেমা ১৯-২০
আয় কমেছে সাধারণ মানুষের ২১-২২
ফেরত আসছে না ব্যাংক খাতের খোয়া যাওয়া টাকা-২৩-২৪
খাশোগি হত্যা : রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ ২৫
তরুণ ভোটার টানতে সোস্যাল মিডিয়ায় ঝুঁকেছে আ'লীগ ২৭-২৮
প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের সংবাদপত্র ২৯-৩১
শওকত আলীর অপ্রকাশিত দু'টি কবিতা-৩৩
হেলাল হাফিজের কবিতা-৩৪
যুদ্ধ-৩৫
ভালো উপদেশ রুবির চেয়েও দুষ্প্রাপ্য।। সালমান রুশদি-৩৭
দুনিয়া মিখাইলের কবিতা-৩৯
তিনটি কবিতা।। মঈন মুনতাসীর-৪১
ষড়ঋতু।। মাসুম মুনাওয়ার ৪২-৪৩
একটি রাত ও অর্ধদিনের কাব্য ৪৪-৪৫
টেলিফোন সাক্ষাৎকারে নোবেল জয়ী কাজুও ইশিগুরো-৪৬
চিরশ্রী দেবনাথের কবিতা-৪৭

মহান বিজয় দিবসে আত্মজিজ্ঞাসা

যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত থেকে আমাদের ওপর বর্বর হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল, পরবর্তী নয় মাস ধরে এক সর্বাত্মক জনযুদ্ধে আমরা তাকে প্রতিহত করেছিলাম। সে বছরের ১৬ ডিসেম্বর ওই বর্বর দখলদার বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করি। এই দিনটি বাঙালির সেই বিজয় উদযাপনের দিন।

পৃথিবীর অনেক দেশের ঔপনিবেশিক পরাধীনতার অবসান ঘটেছে রক্তপাত ছাড়াই। তবে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অগণিত মানুষের প্রাণের বিনিময়ে। তাই প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উদযাপনের সময় আমরা সর্বাগ্রে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধের অগণিত শহীদকে।

আমাদের বিজয়ের ৪৭ বছর পরও আত্মজিজ্ঞাসা রয়ে গেছে-স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের পেছনে যে স্বপ্ন ও আকাঙ্খা ছিল, তার কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে? মুক্তিযুদ্ধের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতি কতটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি? কতটা গণতান্ত্রিক হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনার প্রক্রিয়াগুলো? রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্মে এবং তাদের পারস্পরিক আচরণে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি কতটা বিকশিত হয়েছে? আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিকের সমান অধিকার কি নিশ্চিত হয়েছে? সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ছিল স্বাধীনতার চেতনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে?

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি ঘটেছে, দারিদ্র্য কমেছে। কিন্তু গণতন্ত্র এখনো ভঙ্গুর, আইনের শাসন দুর্বল। রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবনমন মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও আকাঙ্খা বাস্তবায়নে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। ধর্মের নামে উগ্র রাজনীতি জন্ম দিয়েছে হিংস্র জঙ্গিবাদের। আমাদের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলায় মনোযোগী হতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরমতসহিষ্ণুতা, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যা-সংকট সমাধানের মানসিকতা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য। রাজনৈতিক মতভিন্নতা সত্ত্বেও একটি সচল ও কার্যকর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সব পক্ষের আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন।

বিজয় দিবসে আমাদের সুখী-সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার আসুন আবারো নবায়ন করি প্রত্যেকের জীবনে।

বিজয়ের এই আনন্দঘন স্মরণের দিনে আমাদের সম্মানিত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতাসহ দেশবাসীর জন্য রইলো সর্বাত্মক শুভ কামনা।

সম্পাদক: তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু
ড্রীম হাউজ (২য় তলা), বাড়ি: ১/এ, রোড: ১৬/এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, ফোন: ০২-৯৮৮১৮৬০
সম্পাদনা সহযোগী: মহিউদ্দীন মোহাম্মদ ও কাওসার আলম
প্রকাশকাল: ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮, **প্রচ্ছদ:** চারু পিন্টু
মুদ্রণ: ডোনা প্রিন্টার্স, ৬০/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০১৭১১-৩২৭০৫৯
বিনিময়: ১০০ টাকা

সূর্যসন্তানদের রক্তে বার বার ভিজেছে দেশ

শেখ মোহাম্মদ হানিফ

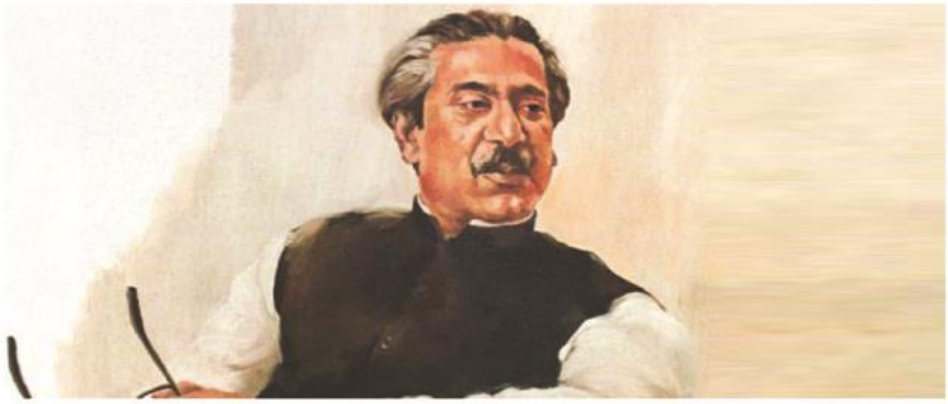

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যেসব মুক্তিযোদ্ধারা জীবনবাজি রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারাই স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক আনুগত্য, মতাদর্শগত লড়াই, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যক্তিগত রেষারেষিতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এসবের পেছনে বড় ধরনের ভূমিকা ছিল বহির্বিশ্বের ইন্ধনও। স্বাধীন ভূ-খণ্ডে তাদের হত্যার ঘটনা জাতির জন্য খুবই দুঃখজনক হলেও এসব খুনের কোনোটিরই হয়নি চূড়ান্ত বিচার, শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি মূল ষড়যন্ত্রকারীদের।

স্বাধীনতার উষালগ্নে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল এম আবু তাহের, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরের মতো মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডাররা স্বগোত্রীয় সশস্ত্র প্রতিপক্ষের হাতে অথবা ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন। সামরিক ও বেসামরিক উভয় অংশের মুক্তিযোদ্ধারা এই রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন।

এসব ঘটনায় চার সেক্টর কমান্ডারসহ ২১ জন খেতাবধারী ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুক্তিযোদ্ধা নিহত (মৃত্যুদণ্ডসহ) হয়েছেন। এছাড়া জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মোট ২২ দফার ক্যুতে প্রায় আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা ও সদস্য খুন এবং নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

স্বাধীনতার পর পরই মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক সংগঠন মুজিববাহিনীর একটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় রক্ষীবাহিনী। এর অপর একটি অংশ দ্বিতীয় বিপ্লবের স্লোগানে স্বাধীনতাত্তোর সরকারের ডাকে সাড়া না দিয়ে বিরোধিতায় নামে। এদেরই একটি অংশ পরবর্তীতে জাসদের নেতৃত্বে গঠিত গণবাহিনীতে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। তাদের দমনে প্রধান ভূমিকা পালন করে রক্ষীবাহিনী, যা ছিল মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেই জীবন সংহারী এক লড়াই। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সেই লড়াইয়ে রক্ষীবাহিনী ও পুলিশসহ অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ৩০ হাজার প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাকর্মী নিহত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যাদের একটি বড় অংশই ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও জাসদ গণবাহিনীর সদস্য। এ ছাড়াও সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টির সদস্য, যারা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন স্বাধীনতাত্তোরকালে তাদের সঙ্গেও রক্ষীবাহিনীসহ সরকারি বাহিনীর একাধিক সশস্ত্র লড়াই সংঘটিত হয়। দলীয়প্রধান মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ সিকদার রক্ষীবাহিনীর হাতে গ্রেফতার ও পরবর্তীতে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন। সে সময় গণবাহিনী, সর্বহারা পার্টি, বিভিন্ন বামপন্থি সশস্ত্র বিপ্লবী ও সরকারদলীয় ক্যাডারদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী হানাহানিতে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা খুন হন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়কার ঘটনাবলী পরবর্তী সময়ে উঠে আসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও লেখকের বইয়ে।

এ সব সূত্র থেকে জানা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সরকারের প্রধান ও চরম শত্রুতে পরিণত হয় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের আরেকটি শক্তি। '৭৫-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের (জাসদ নেতাকর্মী) হত্যা করার। একই সঙ্গে জাসদের বিরুদ্ধেও অনেক মুক্তিযোদ্ধা (আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী) হত্যার অভিযোগ রয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সূর্যসন্তানদের রক্তে লাল হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ইতিহাসবিদদের মতে, এ সব বিরোধে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার ইন্ধনও কাজ করেছিল। তাদের মতে, এ সময় পাকিস্তান ফেরত অ-মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারদের বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সেনা অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্য নিহত হন। সেনা অভ্যুত্থানের কয়েকটি ঘটনায় সামরিক আদালত বা কোর্ট মার্শালে বিচার হলেও তা নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক।

তবে স্বাধীনতার ৪৭ বছরে সেনা অভ্যুত্থান বা পাল্টা অভ্যুত্থানের নামে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে কতজন সেনা কর্মকর্তা ও সদস্য নিহত বা নিখোঁজ হয়েছেন, তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান ও তালিকা সরকারিভাবে এ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। এ সব ঘটনার নেপথ্যের কারণগুলোর সঠিক তদন্ত হওয়ার খবরও জানা যায়নি।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সেনা অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানে দু'জন রাষ্ট্রপ্রধানসহ নিহত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের চারজন সেক্টর কমান্ডার। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের ৩ থেকে ৭ তারিখে সংঘটিত অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানে নিহত হন কে ফোর্সের অধিনায়ক ও ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ (বীরউত্তম)। এই ঘটনায় তার সঙ্গে নিহত হন মেজর হায়দার (বীরউত্তম) ও মেজর নাজমুল হুদাসহ (বীরবিক্রম) আরও বেশ কয়েকজন। সামরিক ক্যু ও পাল্টা ক্যু'তে এসব মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা খুন হলেও, পরবর্তী সময়ে এসব হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হয়নি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদের নেতৃত্বে কিছু মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানফেরত সেনা অফিসার কর্তৃক সংঘটিত এক সেনা অভ্যুত্থানে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তাদেরই হাতে প্রথম নিহত হন বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পাকিস্তানফেরত সেনা অফিসার জামিল আহমেদ। এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে সেনা সদস্যের হাতে সেনা সদস্যের প্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। ১৫ আগস্টের এই বিয়োগান্তক ঘটনায় নিহত শেখ ফজলুল হক মণি ও সেনা অফিসার বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ জামাল ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। এরপর ৩ নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, এম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

এ সব ঘটনার বিবরণসংবলিত বিভিন্ন দলিলপত্রে দেখা যায়, '৭৫-এর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযুদ্ধের ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ও জাসদ নেতা কর্নেল এম আবু তাহেরের নেতৃত্বে 'সিপাহী-জনতা'র বিপ্লবের নামে সংঘটিত পাল্টা অভ্যুত্থানে জেনারেল খালেদ মোশাররফকে হটানো হয়। এ সময় সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফসহ আরও দু'জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় প্রথম কোনো সেক্টর কমান্ডার নিহত হলেন। ৭ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানের পর সরকারের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাতে।

বর্তমানে ৭ নভেম্বরের এই ঘটনাকে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি' দিবস হিসেবে পালন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ এই দিনটিকে 'মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছে।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে দায়ের করা এক হত্যা মামলায় সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এম আবু তাহেরকে, যা ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই কার্যকর করা হয়।

সেনাবাহিনীতে কর্মরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে ১৯৮১ সালে ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, ১ নম্বর ও পরবর্তী সময়ে ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার এবং জেড ফোর্সের প্রধান জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর।

সেনা অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হলে অভ্যুত্থানের দায়ে ৩৩ জন সেনা অফিসার ও সদস্যকে অভিযুক্ত করে সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

এর আগে জিয়া হত্যাকাণ্ডের প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে (বীরউত্তম) গ্রেফতার ও পরে ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়। তবে বিচারের অধীনে না এনে জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করায় জিয়া হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী সম্পর্কে আজও জাতির কাছে অজানাই থেকে গেছে। অন্যদিকে মঞ্জুরকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হয়েছে এমন অভিযোগ এনে তৎকালীন সেনাপ্রধান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করে মঞ্জুরের পরিবার। তবে নিম্ন আদালতে চলা সে মামলার রায়ের তারিখ ও বিচারক পাল্টেছে বহুবার। মঞ্জুরের সঙ্গে ওই সময় নিহত হন তার ভাগ্নে কর্নেল মাহবুবুর রহমান (বীরউত্তম) ও লে. কর্নেল মতিউর রহমান (বীরপ্রতীক)।

সরকারি তালিকানুযায়ী অভিযুক্তরা হলেন- ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন আহমদ (বীরবিক্রম), লে. কর্নেল এ ওয়াই এম মাহফুজুর রহমান (বীরবিক্রম), মেজর নওয়াজিস উদ্দিন, মেজর এম এ রশীদ (বীরপ্রতীক), মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন (বীরপ্রতীক), ক্যাপ্টেন এ জেড গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ, রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া (বীরপ্রতীক), লেফটেন্যান্ট মজিবুর রহমান, মোহাম্মদ মারুফ রশিদ, ক্যাপ্টেন আব্দুল কাইয়ুম খান, শওকত আলী (বীরপ্রতীক), মোহাম্মদ লতিফুল আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ ফজলুল হক, কাজী মোমিনুল হক, লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ ইলিয়াস, মোহাম্মদ রেজাউল করিম, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ মোহাম্মদ মুনীর, সালাহউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ রফিক হাসান খান, মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন জামিল হক, সুবেদার সাজদার রহমান, ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার, মোহাম্মদ মুস্তফা, লেফটেন্যান্ট এম এম ইকবাল, মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন, লেফটেন্যান্ট এ টি এম মেসবাহ উদ্দিন সেরনিয়াবত ও মতিউর রহমান।

বিচারে অভিযুক্তদের মধ্যে ১২ জনকে একসঙ্গে এবং আলাদাভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে এ রায় কার্যকর করা হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সেনা অফিসাররা হলেন-ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন আহমদ (বীরবিক্রম), লে. কর্নেল এ ওয়াই এম মাহফুজুর রহমান (বীরবিক্রম), মেজর নওয়াজিস উদ্দিন, এম এ রশীদ (বীরপ্রতীক), মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন (বীরপ্রতীক), ক্যাপ্টেন এ জেড গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ, রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া (বীরপ্রতীক), লেফটেন্যান্ট মজিবুর রহমান, ক্যাপ্টেন কাজী মোমিনুল হক, লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ক্যাপ্টেন জামিল হক, লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ রফিক হাসান খান। এ ছাড়া সরকারি তালিকায় অভিযুক্ত নন কিন্তু সামরিক আদালতের বিচারে পরবর্তী সময়ে ফাঁসি কার্যকর করা হয় লে. কর্নেল শাহ মোহাম্মদ ফজলে হোসেনের।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসেবে সাবেক সেনা তারা রাষ্ট্রীয় ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাদের ষড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্যই ছিল চরিত্র হননের মাধ্যমে সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের স্বীয় পদ থেকে সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করা।'

কর্নেল শাফায়াত জামিল তার বইয়ে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোকে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যের রক্তে বাংলাদেশকে লাল করে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ নেওয়া অপর আরেকটি শক্তি।

স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সময়টাকে মুক্তিযুদ্ধের সূর্যসন্তানদের হারিয়ে যাওয়ার সময় হিসেবে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

অফিসার কর্নেল শাফায়েত জামিল তার 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর' বইয়ে লিখেছেন, 'আজো একটি প্রশ্ন বহু লোকের মনকে আলোড়িত করে, অনেকে আমাকেও জিজ্ঞাসা করেন, ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান কেন হয়েছিল? তৎকালীন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একাধিক কারণের উল্লেখ করব না আমি। সে দায়িত্ব রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ইতিহাসবিদদের। যে পরিমণ্ডলে আমার অবস্থান ছিল, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব আমার বক্তব্য। আমি পেছনে ফিরে দেখি, সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে একটা রেষারেষি ছিল। কিছুসংখ্যক অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসার, যারা মূলত যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান প্রত্যাগত, তারা মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সহ্য করতে পারতেন না। কয়েকজন সিনিয়র অ-মুক্তিযোদ্ধা অফিসার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে শুরু করেন। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতায় এ ব্যাপারে কথা হয় মেজর মঞ্জুরের খুব কাছাকাছি থাকা সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) জীবন কানাই দাসের সঙ্গে। তিনি বিতর্কিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে কোনো মন্তব্য করেননি।

সামরিক বাহিনীর বাইরে বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কাদেরীয়া বাহিনীর প্রধান বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী দ্য রিপোর্টকে বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই আমেরিকার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের একটি বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হেনরী কিসিঞ্জার সে সময়ে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কিংবা ভারত বা পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে, সেটা আমার কাছে বড় বিষয় নয়। বড় বিষয় হল, ব্যক্তিগতভাবে আমার কূটনৈতিক পরাজয় ঘটেছে।' কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, 'হেনরী কিসিঞ্জাররা যখন কোনো বিষয় ব্যক্তিভাবে নেন, তখন তার জের থাকে দীর্ঘমেয়াদি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তারই কোনো জের কি-না, কে জানে।'

কর্নেল তাহের

খালেদ মোশারফ

মেজর মেজারেল মঞ্জুর

বারবার কাঁটা ছেড়া: ৪৭ বছরেও হয়নি কাঙ্খিত শাসন কাঠামো

খাদেমুল ইসলাম

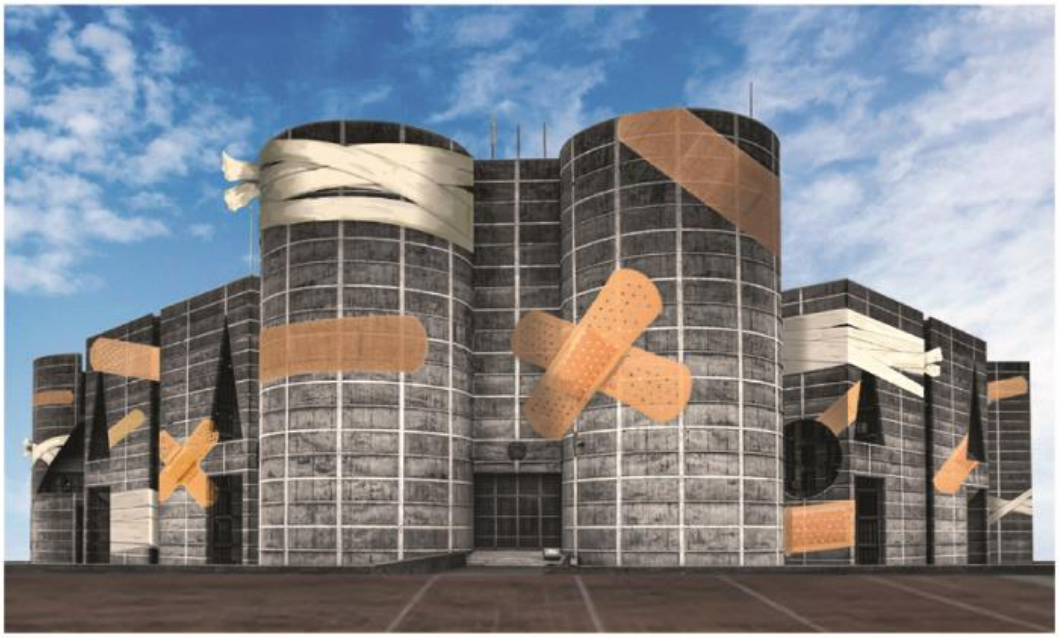

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীন দেশ পরিচালনার জন্য এক বছরের মধ্যেই একটি সংবিধান প্রণয়ন ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব। কিন্তু তার শাসনামলেই চার বার সংবিধান সংশোধনের ঘটনা ঘটে। আর সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৪৬ বছরে সংশোধনী আনা হয়েছে ১৭ বার। সংবিধানের মৌল কাঠামোও পরিবর্তিত হয়েছে এসব সংশোধনীতে। তবে অধিকাংশ সংশোধনীই হয়েছে ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছানুযায়ী এবং তাদের রাজনৈতিক বা দলীয় স্বার্থে। সংবিধানে জনগণকে রাষ্ট্রের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হলেও বাস্তবে শাসন কাঠামো পরিবর্তনে তাদের মতামতকে উপেক্ষাই করা হয়েছে বেশিরভাগ সময়। বরং ক্ষমতাসীনদলগুলো তাদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিয়েছে জনগণের ওপর। যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সে সরকারই সংবিধানকে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী হয় পরিবর্তন করেছে কিংবা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করেছে। ফলে সংবিধানের সঙ্গে রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের তেমন কোন সম্পৃক্ততাই গড়ে উঠেনি। রাজনৈতিক স্বার্থে সংবিধান সংশোধনীর বিষয় নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা থাকলেও ক্ষমতাসীনদলগুলো এতে খুব একটা তোয়াক্কা করেনি। তাই সংবিধানের বারবার এই কাটা-ছেঁড়ার ফলে ৪৬ বছরেও একটি কাঙ্ক্ষিত শাসন কাঠামো পায়নি বাংলাদেশ। বারবার সামরিক শাসন জারি, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, পরিবার কেন্দ্রিক রাজনীতি ও দুর্নীতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার জন্য নির্বাচিত সদস্যরাই গণপরিষদের সদস্য হন। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। যার প্রধান করা হয় তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে। কমিটিকে ১৯৭২ সালের ১০ জুনের মধ্যে খসড়া সংবিধানসহ কমিটির রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া সংবিধানসহ গণপরিষদে রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধানটি বিল আকারে পেশ করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ একই বছরের ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পাস হয়। পরবর্তীতে বিজয় দিবসের সঙ্গে মিল রেখে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে সংবিধান কার্যকর করা হয়।

সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৪৬ বছরে ১৭ বার সংশোধনী যেমন সামরিক সরকারগুলোর সময়ে হয়েছে, তেমনই হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত সরকারগুলোর সময়েও। অধিকাংশ হয়েছে ক্ষমতাকে সংহত করার জন্য। কোনটি আনা হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে। অবশ্য পরবর্তীতে এসব সংশোধনীর

অর্ধেকেরও বেশি বিভিন্ন কারণে অকার্যকর হয়ে পড়ে। কয়েকটি সংশোধনী সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এবং কয়েকটি পরবর্তীতে আনা সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যকারিতা হারিয়েছে।

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংক্রান্ত বিধান নিয়েই হয়েছে একাধিক সংশোধনী। তাছাড়া বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে থেকে নির্বাচনের সুযোগ ও বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের কারণে একবার করে সংশোধন করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান বিচেনায় প্রথম সংসদে সর্বোচ্চ ৪টি, দ্বিতীয় সংসদে দুটি, তৃতীয় সংসদে একটি, চতুর্থ সংসদে তিনটি, পঞ্চম সংসদে দুটি, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম সংসদে একটি করে এবং দশম সংসদে দুটি সংশোধনী আনা হয়।

এর মধ্যে সংবিধানের মৌল কাঠামোকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে এমন সংশোধনী হয়েছে অন্তত চারটি। বাকি ১০টিতে শাসন কাঠামোতে কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। তিনটি এসেছে বিশেষ ইস্যুতে (নারী আসন ও বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের প্রত্যাবর্তন)।

নির্বাচন ব্যবস্থাকে কমবেশি প্রভাবিত করেছে এমন সংশোধনী রয়েছে অন্তত: নয়টি। এর মধ্যে সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে। এছাড়া শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ও নির্বাচনী নিয়মে বাকি সব পরিবর্তন এসেছে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে।

আর বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে সংকোচন বা প্রভাবিত করেছে অন্তত ছয়টি সংশোধনী। এর মধ্যে উচ্চ আদালতের বিচারক অপসারণ সংক্রান্ত সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন হয়েছে পাঁচবার। দুইবার বয়স বৃদ্ধির কারণে হয়েছে। আর তিনবার হয়েছে বিচারক অপসারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে এমন সংশোধনীর কার্যকারিতা আদালতের রায়ে অধিকাংশই বাতিল হয়ে গেছে।

উপরোক্ত তথ্যেও পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৭টি সংশোধনীর মধ্যে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এসেছে সামরিক সরকারকে বৈধতা দিতে বা যারা যে সময় ক্ষমতায় ছিল তাদের ক্ষমতাকে সুসংহত করতে। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রত্যেকটি সংশোধনীর বিষয়বস্তু, বর্তমান অবস্থা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

প্রথম সংশোধনী : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত

সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয় ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৭ অনুচ্ছেদে দুটি নতুন উপধারা সংযোজন করা হয়। এ সংশোধনীর মূল কারণ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য আইন তৈরি এবং তা কার্যকর করা। সেই সংশোধনী আনয়নের পরই ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন পাস করা হয়। সেই আইন অনুযায়ী ২০১০ সালের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধে সম্পৃক্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিচার শুরু হয়। বিচারে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন শীর্ষনেতাসহ ছয় জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। আরও অনেকের রায় হওয়ার পর তা আপিল শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। অনেকের বিচার চলছে।

একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন দেশের মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারীদের বিচারকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে এই সংশোধনীটি সময়ের প্রয়োজনেই আনা হয়েছিল।

দ্বিতীয় সংশোধনী: জরুরি অবস্থার বিধান

১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে জরুরি অবস্থা জারির বিধান, নিবর্তনমূলক আটকের অনুমোদন দেয়া হয়।

নিবর্তনমূলক আটক, জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও এ সময় মৌলিক অধিকারগুলো স্থগিতকরণ সম্পর্কে প্রথমদিকে সংবিধানে কোনো বিধান ছিল না। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিধানগুলো সংযোজন করা হয়। এই সংশোধনীটির ভালো দিক যেমন আছে তেমন সমালোচনাও আছে। নিবর্তনমূলক আটকের বিধান নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।

তবে একটি রাষ্ট্রে বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত বা অভ্যন্তরীণ সংকটের সৃষ্টি হলে অনেক সময় জরুরি অবস্থা জারি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেই দিক থেকে সংবিধানে এমন বিধান যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদিও যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া দেশে একটি আদর্শ সংবিধান রচনার জন্য তখন জরুরি অবস্থার বিধান রাখা হয়নি। পরে সময়ের প্রয়োজনেই সংশোধনীটি আনা হয়। তবে এই বিধানের অপপ্রয়োগের নজিরও রয়েছে।

তৃতীয় সংশোধনী: বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি

ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণী একটি চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর এ সংশোধনী আনা হয়। ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির অনুসমর্থন দেয়া হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে। চুক্তিটির মূল বিষয়বস্তু ছিল দুই দেশের সীমান্তে কয়েক দশক ধরে চলা বিরোধপূর্ণ এলাকা ও ছিটমহল বিনিময়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুসমর্থন করলেও ভারত তা ঝুলিয়ে রাখে। সবশেষ ২০১৫ সালের ৭ মে ভারতের লোকসভায় এই চুক্তিটি অনুমোদন দেয়া হয়। ২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই সংশোধনী কার্যকর রূপ লাভ করে।

দীর্ঘদিন পর ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে চুক্তিটি পূর্ণতা লাভ করে। বিলম্বে হলেও বাংলাদেশের সংসদে অনুমোদিত এই সংশোধনীটি শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে কার্যকর হয়েছে। যা দু'দেশের সীমান্তে বিরোধ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

চতুর্থ সংশোধনী: সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু

সংবিধান কার্যকরের পরবর্তী বছর ১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদ নির্বাচন হয়। সেই সংসদে স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে। সেই সংসদের দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই শাসন ব্যবস্থার মৌল কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।

যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সংসদীয় সরকার পদ্ধতি থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু। এই সংশোধনীতে সংসদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষায় ১৯৭২ সালে যেসব অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছিল তার মধ্যে বিচারপতি নিয়োগ, অপসারণ,

অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয়। তাছাড়া হাইকোর্টের মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের ক্ষমতা রহিত করা হয়। সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া সংসদের মেয়াদ ১৯৭৫ সাল থেকে পাঁচ বছর করা হয়।

একটি জাতীয় দল গঠনের বিধান রেখে বাকি সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। সবমিলিয়ে এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির হাতে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়।

এসব পরিবর্তনের পেছনে দেখানো হয় সদ্য স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন। এই সংশোধনী রাজনীতিতে কতটুকু ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকা রাখে তা পরবর্তীতে বিচার করার সময় পাওয়া যায়নি। কারণ, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে এই সংশোধনী আনয়নের সাত মাসের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সেনা অভ্যুত্থানে স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। তাই এই সংশোধনী পুরোপুরি প্রয়োগের আগেই কার্যকারিতা অনেকাংশে শেষ হয়ে যায়। তবে পরবর্তীতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই সংশোধনীর কঠোর সমালোচনা করে। আওয়ামী লীগ এই সংশোধনীকে দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করে থাকে। তবে বিরোধীরা এই সংশোধনীকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণের সংশোধনী হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকে।

পরে ১৯৯১ সালে আনা দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত কিছু বিধান, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকারের মতো কিছু বিধান ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পুনর্বহাল করা হয়।

পঞ্চম সংশোধনী: সামরিক ফরমান সমূহের অনুমোদন

জাতীয় সংসদে এ সংশোধনী আনা হয় ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল। পঞ্চম সংশোধনী সংবিধানে কোনো বিধান সংশোধন করেনি। তবে এ সংশোধনী ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট সামরিক শাসন জারির পর থেকে ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত সামরিক শাসনামলের সব ফরমান, আদেশ ও অন্যান্য আইন, ফরমানের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন, সংযোজন পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধনসহ যাবতীয় কার্যক্রম বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। এসব আইন সম্পর্কে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না, মর্মেও বিধান করা হয়।

সামরিক ফরমানের মাধ্যমে এই সংশোধনীর আগেই সংবিধানের চার মূলনীতিসহ মৌলিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের মূল চরিত্র পরিবর্তন করে দেশকে একটি ধর্মীয় রূপ দেয়া হয়। এর পেছনে ছিলেন তৎকালীন প্রধান সামরিক প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। পরবর্তীতে বেসামরিকীকরণের অংশ হিসেবে সংসদ নির্বাচন দিয়ে তিনি সামরিক ফরমান সমূহ সেই সংসদে অনুমোদন করিয়ে নেন। অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা গ্রহণের দায়মুক্তিও দেয়া হয়েছে এতে। তাছাড়া ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ নিহতদের বিচারের পথও রুদ্ধ হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে।

তবে এই সংশোধনীতে বিচার বিভাগকে কিছু ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক দল করার অধিকার এবং সংবাদপত্র প্রকাশের অধিকারও ফিরিয়ে দেয়া হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে। বিএনপি এটিকে বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। তবে বিরোধী পক্ষের দাবি- প্রকৃতপক্ষে জিয়াউর রহমানের সামরিক ফরমানের বৈধতাই দিতেই হয়েছে এই সংশোধনী।

এই সংশোধনীটি উচ্চ আদালতের রায়ে বাতিল হয়েছে। পুরান ঢাকার মুন সিনেমা হলের মালিকানাকে কেন্দ্র করে ২০০৫ সালের আগস্টে হাইকোর্ট এই সংশোধনীটি বাতিল করে। পরে আপিল বিভাগ ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টের দেয়া রায় কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে এর বিরুদ্ধে করা লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) খারিজ করে দেন। এই রায়ে রাজনৈতিক দল করার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক কিছু বিষয় সর্বোচ্চ আদালত মার্জনা করে দেন। তাই পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগ ও গণতন্ত্রে উত্তরণ সংক্রান্ত ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ থেকে যায় সংবিধানে।

ষষ্ঠ সংশোধনী: উপরাষ্ট্রপতি পদে থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান

১৯৮১ সালের ১০ জুলাই এ সংশোধনী আনা হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক ব্যর্থ সামরিক বাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। এরপর উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তখন ক্ষমতাসীন বিএনপি রাষ্ট্রপতি পদে তাদের প্রার্থী হিসেবে আব্দুস সাত্তারকে মনোনয়ন দেয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি পদে থেকে আব্দুস সাত্তারকে নির্বাচন করার সুযোগ দিতেই সংশোধীনটি আনা হয়। মূলত: দলীয় স্বার্থেই বিএনপি এই সংশোধনীটি এনেছিল।

দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার পুনর্বহাল হওয়ায় সংবিধানের এ সংক্রান্ত বিধানটি এখন অনেকাংশেই অকার্যকর।

সপ্তম সংশোধনী: এরশাদের শাসনের বৈধতা

জিয়াউর রহমানের মতো একইভাবে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রায় ৫ বছর তার সামরিক শাসনের বৈধতা দেন সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে। ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর জাতীয় সংসদে সপ্তম সংশোধনী আনা হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক ক্যুর পর থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসনামলে জারি করা সব আদেশ, আইন ও নির্দেশকে বৈধতা দেওয়া হয়। একইসঙ্গে আদালতে এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না করার বিধান করা হয়। এ সংশোধনীতে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করা হয়।

২০১০ সালের ২৬ আগস্ট এ সংশোধনী হাইকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়। পরে ২০১১ সালে আপিল বিভাগও সেই রায় বহাল রাখেন।

অষ্টম সংশোধনী: রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও ৬টি বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপন

১৯৮৮ সালের ৯ জুন সংবিধানে অষ্টম সংশোধনী আনা হয়। এ

সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিদেশি খেতাব গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয় এতে। এছাড়া ঢাকার বাইরে ৬টি বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠনের কথা বলা হয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের বিধানটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হিসেবে তা বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। যে কারণে বিভাগীয় শহরে আর হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপিত হয়নি।

তবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থেকে যায়। এরশাদ জনগণের ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকার পথ সুগম করতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি দেন বলে অনেকে মনে করেন। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত বিধানটি পরবর্তী কোনো সরকার বাতিল করেনি। যা এখনো সংবিধানে বহাল আছে।

নবম সংশোধনী: রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদ দুইবার সীমাবদ্ধ

নবম সংশোধনী আনা হয় ১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে কিছু বিধান সংযোজন করা হয়। এ সংশোধনীর আগে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি যতবার ইচ্ছা নির্বাচন করতে পারতেন। এ সংশোধনীর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৫ বছর করে দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা হয়। এ ধরনের সংশোধনী নিজের ক্ষমতাকালকে প্রলম্বিত করার চেষ্টা করেন এরশাদ। যদিও এই সংশোধনী আনয়নের পর এক বছরের কিছু বেশি সময় পর তাকে পদ ছাড়তে হয়েছিল।

দশম সংশোধনী: নারী আসনের মেয়াদ ১০ বছর বৃদ্ধি

১৯৯০ সালের ১২ জুন দশম সংশোধনী বিল পাস হয়। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ১৫ থেকে ৩০-এ উন্নীত করা হয়। নারী আসনের মেয়াদ ১০ বছর বৃদ্ধি করা হয়। নারীর ক্ষমতায়নে সংশোধনীটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও শাসন কাঠামোতে এর কোনো প্রভাব পড়েনি।

একাদশ সংশোধনী: বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে স্বপদে প্রত্যাবর্তন

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ তিন জোটের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন। পরে একইদিনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করলে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন। তার অধীনেই ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্চম সংসদ নির্বাচন হয়।

সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে তার দেয়া শর্ত অনুযায়ী পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে ফিরিয়ে নিতে এই সংশোধনী আনয়ন করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী: সংসদীয় ব্যবস্থা পুনর্বহাল

১৯৯১ সালের এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৬ বছর পর রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেই আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সেই আওয়ামী লীগই এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯১ সালের ২ জুলাই সংশোধনীটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংসদে উত্থাপন করেন। আর গণভোটের মাধ্যমে একই বছর ১৪ সেপ্টেম্বর সংশোধনীটি কার্যকর হয়।

এই সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা একেবারে সীমিত করে প্রধানমন্ত্রীকে চূড়ান্ত নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া হয়। সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্ত করে প্রত্যক্ষ ভোটের পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয়। এই সংশোধনীটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সংশোধন।

মূলত: শাসন কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সংসদকে ক্ষমতাশালী করতেই এই সংশোধনী। তবে সংসদ কতটা ক্ষমতাসীন হয়েছে, আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কতটা কুক্ষিগত হয়েছে তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এখন আবার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

ত্রয়োদশ সংশোধনী: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রবর্তন

১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনের মুখে এই সংশোধনী পাশ করে তৎকালীন বিএনপি সরকার। যেখানে নির্বাচনকালীন একটি নিরপেক্ষ সরকার গঠনের বিধান করা হয়। এই বিধান অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের ১২ জুন, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর ও ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর তিনটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

তবে ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান অবৈধ ঘোষণা করেন। যা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যকর করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। ওই মামলায় সর্বোচ্চ আদালতে বক্তব্য দেয়া ১০ জন অ্যামিকাস কিউরির (আদালতের বন্ধু, যাদের বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের থেকে নেয়া হয়) মধ্যে ৯ জনই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। সে কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল নিয়ে বিরোধী পক্ষের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

চতুর্দশ সংশোধনী: বিচারপতির বয়স ও সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি

২০০৪ সালের ১৬ মে এ সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করা হয়। এছাড়া সরকারি ও আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি বা ছবি প্রদর্শনের বিধান করা হয়।

এই সংশোধনীতে বিচারপতির অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধির কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কারণ, সংবিধান অনুযায়ী সবশেষ অবসর গ্রহণ করা প্রধান বিচারপতিই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার কথা। তাই বিশেষ ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিতেই বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো হয় বলে বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করে। তারা সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। পরবর্তীতে সেই আন্দোলনের জেরেই ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনা সমর্থিত সরকার এসে দুই

বছর দেশ শাসন করে। সেটিকে উদাহরণ হিসেবে ধরেই ত্রয়োদশ সংশোধনীতে আনা 'বিতর্কিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা' বাতিল করা হয়।

তাই তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের আনা এই সংশোধনীটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একধাপ পিছিয়ে দেয়। এর জেরেই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য ঐকমত্যের ভিত্তিতে আনা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এটি বিচার বিভাগকেও প্রভাবিত করে।

পঞ্চদশ সংশোধনী: বাহাত্তরের মূলনীতিতে প্রত্যাবর্তন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল

২০১১ সালের ৩০ জুন এ সংশোধনী আনা হয়। এই সংশোধনীতে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়। অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বিবেচনায় সর্বোচ্চ দণ্ডের বিধান রাখা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ৭২'র সংবিধানের চার মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি এ সংশোধনীতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০-এ উন্নীত করা হয়।

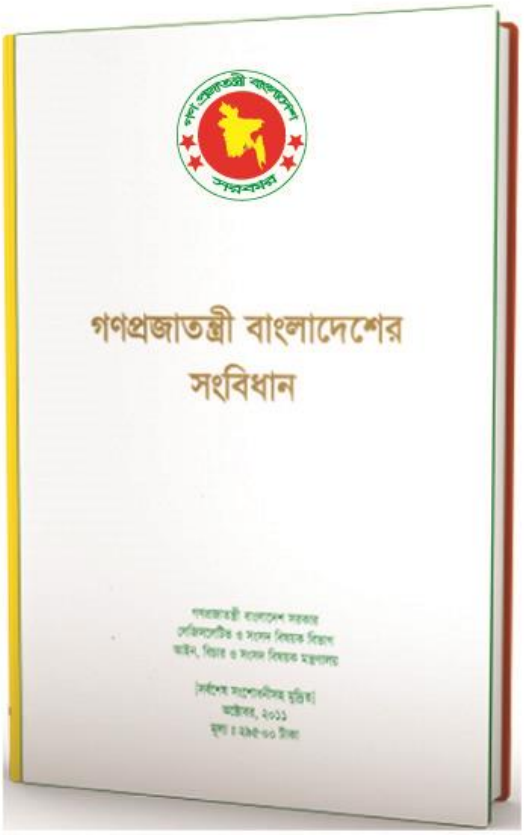

মূলত: পঞ্চম, সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে আদালতের দেয়া রায় বাস্তবায়ন করতেই এই সংশোধনী আনা হয়। বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, আদালতের রায় বাস্তবায়ন নয়; ক্ষমতায় থাকার পথকে দীর্ঘায়িত করতেই এই সংশোধনী আনা হয়।

ষোড়শ সংশোধনী: বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সংসদকে প্রদান

উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থেকে সংসদের হাতে ফিরিয়ে দিতে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধন পাস হয় ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

১৯৭২ সালের সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ ক্ষমতা ছিল সংসদের হাতে। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা দেয়া হয় রাষ্ট্রপতির হাতে। ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান এই ক্ষমতা দেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে। পঞ্চম সংশোধনী সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হওয়ার সময় এই অংশটুকু সর্বোচ্চ আদালত মার্জনা করে দেন। তাই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল রেখেই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়।

বিরোধী দলগুলোর বর্জনের মধ্যে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে আনীত সে সংশোধনীতে ১৯৭২ সালের সংবিধানের আলোকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সংসদকে প্রদান করা হয়।

এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব হয়েছে উল্লেখ করে ২০১৬ সালে হাইকোর্ট তা বাতিল ঘোষণা করেন। পরের বছর আপিল বিভাগ সেই রায় বহাল রাখেন। সেই রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে সরকারের করা আবেদন আপিল বিভাগে বিচারাধীন আছে।

এই রায়ের ফলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এসকে) সিনহার সঙ্গে সরকারের একধরনের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। সেই টানাপোড়েনের জেরে এসকে সিনহাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাই এই সংশোধনীটি সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত-সমালোচিত।

সপ্তদশ সংশোধনী: নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি

পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০-এ উন্নীত করা হলেও মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। তাই চলতি বছর জুলাইয়ে সপ্তদশ সংশোধনী এনে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ আরো ২৫ বছর বাড়ানো হয়।

যেসব সংশোধনী সংবিধানের মৌল কাঠামোকে স্পর্শ করেছে তার সুফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনরা পেয়েছে। কিন্তু এসব সংশোধনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন কতটুকু হয়েছে, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

দলীয় সরকারের অধীনে কেমন নির্বাচন হবে?

পাভেল খাশোগী

সরকারে থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কয়েকটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে নির্বাচনগুলো কখনও আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি বয়কট করেছে। '৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বর্জন করে আওয়ামী লীগ ও তাদের জোট। অপরদিকে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি এবং তাদের সমমনা জোট। আগামী ৩০ ডিসেম্বর একাদশ সংসদ নির্বাচন। এর আগে ১৯৮৬ সালে এরশাদের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন বয়কট করেছিল বিএনপি। এরশাদের সামরিক শাসন অবসানের পর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ফিরে আসার পর এবারই প্রথমবারের মতো দলীয় সরকারের অধীনে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে । গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেনকে সামনে রেখে ঐক্যফ্রন্টের নেতৃত্বে বিএনপিসহ তাদের সমমনা জোট দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনি লড়াইয়ে রয়েছে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তাদের জোটে থাকা দলগুলোও রয়েছে নির্বাচনে। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে হতে যাওয়া নির্বাচন কতখানি বিতর্কমুক্ত পরিবেশে শেষ করবে ক্ষমতায় থাকা দল আওয়ামী লীগ? নাকি নতুন কোন ইতিহাস হয়ে থাকবে ৩০ ডিসেম্বরের ভোট? দেশের রাজনৈতিক সচেতন মানুষের মনে ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন উঠে আসছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরপেক্ষ ভোট অনুষ্ঠিত হবে নিশ্চয়তা দিয়ে বিএনপসহ বিরোধী শক্তিগুলোকে নির্বাচনমুখী করেছেন। সংলাপে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে সুষ্ঠু ভোট হবে এই নিশ্চয়তা দেন শেখ হাসিনা। এরপরই পক্ষ ও বিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি সকলেই নির্বাচনমুখী হয়েছে। এ নির্বাচন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে যেমন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে তেমনি গণতন্ত্রের পথ আরও সঙ্কুচিত ও সৌন্দয্য হারাতে পারে। এক্ষেত্রে বাহবা যেমন নেওয়ার সুযোগ যেমন আছে তেমনি দুর্নামও। এদিকে শুরু থেকেই ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে থাকা বিএনপি নির্বাচন নিয়ে নানা অভিযোগ করে যাচ্ছে। সর্বশেষ বিএনপির মহসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলামের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনাকে সরকারের উপর দায় চাপিয়েছে বিএনপি। তবে আওয়ামী লীগ বলছে, বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে হামলার এ ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনা যাই হোক, এ ধরণের ঘটনা অব্যাহত থাকলে নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা, আতঙ্ক এসব বাড়তে থাকবে। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়ায় এসব আশঙ্কা ও আতঙ্ক দূর করার দায়িত্ব ক্ষমতাসীন দলের ওপরই বর্তায়। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এসব ঘটনা হোক বা না হোক।

এক্ষেত্রে বিএনপিকেও গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই এগুতে হবে। সেটা তারা কতটা দায়িত্বশীলভাবে পালন করবে সেটাও জনগণ পর্যবেক্ষণ করবে। দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হলে বিএনপিও এ দায় থেকে মুক্তি পাবে না। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন নানা দলে থাকতেই পারে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ করে তুলতে পারলে নির্বাচন এলেই সবসময় যে জটিলতা দেখা দেয় তার একটি স্থায়ী কাঠামো দাঁড়িয়ে যেতে পারে এই নির্বাচনের ভেতর দিয়ে।

এজন্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়িত্বশীল ও নির্মোহ হতে হবে। ঢালাও অভিযোগ যেমন সরকারের বিপক্ষ শক্তিগুলোর তোলা ঠিক হবে না, তেমনি ক্ষমতাসীনদেরও বিরোধী পক্ষের প্রতি সহনশীল মনোভাব দেখানো উচিত বলেই মনে করে বিভিন্ন মহল।

অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। আওয়ামী লীগ প্রতিনিয়ত সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। তিনি বলেন, বিরোধী শক্তিগুলোর সহযোগিতা পেলে এক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ আরও সুগম হবে। রাজ্জাক বলেন, বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, এটা দুঃখজনক।

বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হবে এমন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি সরকার। সরকারের আচরণে দিনকে দিন স্পষ্ট হচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে তাদের নীল নকশা রয়েছে। তিনি বলেন, জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, আর কোন অন্যায় জনগণ সহ্য করবে না। তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন করার মানসিকতা ক্ষমতাসীনদের নেই, তবে জনগণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে, সুষ্ঠু নির্বাচন তারা আদায় করে নিবেই।

মহাজোটের কৌশলী ১৮৪ আসন

দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক : একাদশ সংসদ নির্বাচনে আসন বণ্টন নিয়ে জোট ও মহাজোটের প্রধান আওয়ামী লীগের ওপর অসন্তুষ্ট শরিকরা। জোটের বাইরে গিয়ে ১৬৯ আসনে শরিকদলগুলো আলাদাভাবে প্রার্থী দেওয়ায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ভরাডুবির আশঙ্কাও করছেন অনেকেই। কিন্তু এ নিয়ে নির্ভার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জোট-মহাজোটের বাইরে গিয়ে পৃথক প্রার্থী দেওয়াকে নেতিবাচকভাবে নেয়নি তারা।

কারণ হিসেবে তারা বলছেন, দেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সব প্রস্তুতি চালিয়ে গেলেও নির্বাচন থেকে যেকোনো সময় সরে দাঁড়াতে পারে-এমন সন্দেহ আছে আওয়ামী লীগের ভেতরে। সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে জোট-মহাজোটের পৃথক প্রার্থী থাকলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে আর 'প্রশ্ন উঠবে না'। মূলত এ কারণে জোটের বাইরে গিয়ে দলগতভাবে প্রার্থী ঘোষণাকে আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একাধিকবার সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমরা কিছু আসন উন্মুক্ত রাখব। জোট-মহাজোটের কোন দল চাইলে ওই আসনগুলোতে পৃথক প্রার্থী দিতে পারে। আমরা আপত্তি করবো না।' নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলারের সঙ্গে সম্প্রতি সচিবালয়ে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের ওবায়দুল কাদের বলেন, আমাদের একটা কৌশল আছে। কৌশলটা তো বলব না। এমনিই ছেড়ে দিয়েছি আমরা? আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অ্যালায়েন্স দাঁড়িয়ে গেছে, আমরা না বুঝে কি দিয়েছি। তবে কী কৌশলে এমনটা হয়েছে সরাসরি খোলাসা না করলেও এর পেছনের একটি কারণের কথা তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিএনপিসহ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যদি নির্বাচন থেকে সরে যায়? তারপর? আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফাঁদ তৈরি করতে দেব না।

ক্ষমতাসীন দলের আরো কয়েকজন শীর্ষ নেতাও মনে করেন, জোট-মহাজোটের বাইরে গিয়ে শরিকদলগুলো প্রার্থী দিলেও কোনো সমস্যা হবে না। নৌকার বিজয় আসবেই। আওয়ামী লীগের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা জানান, শেষ পর্যন্ত বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিলে যাতে অংশগ্রহমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে প্রশ্ন দেখা না দেয়-সেজন্যই শরিকদলগুলোর প্রার্থী দেওয়াকে সমস্যা হিসেবে দেখছেন না তারা। বিষয়টি নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যথাও নেই। তবে শেষ পর্যন্ত বিএনপি নির্বাচনে টিকে থাকলে জোট-মহাজোটের আলাদা প্রার্থিতা নিয়ে ভিন্ন চিন্তা করবে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গেছে, সর্বমোট ৪২টি আসনে জোটগতভাবে নির্বাচন করবে জোট-মহাজোট। ১৪ দলীয় জোটের শরীকদের মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি ৫টি, জাসদ (ইনু) ৩টি, জাসদ (আম্বিয়া) ১টি, তরিকত ফেডারেশন ২টি, জাতীয় পার্টি (জেপি) ১টি এবং ১৬ দলীয় মহাজোটের শরিক বিকল্পধারা ৩টি ও জাতীয় পার্টি ২৭টি আসনে জোটগতভাবে লড়বে। তবে জোটের আসন বণ্টনে অসন্তুষ্ট হয়ে শরীকদলগুলো সারাদেশে ১৬৯ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এরমধ্যে জাতীয় পার্টি ১৪৪টি, জাসদ (ইনু) ৫টি ও বিকল্পধারা ২০টি আসনে তাদের প্রার্থীর তালিকা দিয়েছে নির্বাচন কমিশনে। এমন পরিস্থিতিতে ৩০ ডিসেম্বরের ভোটে বিএনপিপ্রধান সরকারবিরোধী রাজনৈতিক জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীদের পাশাপাশি শরিকদের সঙ্গেও লড়তে হবে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের। সবমিলিয়ে ১৬৯ আসনে ত্রিমুখী লড়াইয়ে পড়তে হতে পারে টানা ১০ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগকে।

এ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিকল্পধারা বাংলাদেশের মহাসচিব মেজর (অব.) আবদুল মান্নান বলেন, আমরা ১৬ দলীয় মহাজোটে থেকে নির্বাচন করছি। আবার আওয়ামী লীগের কাছ থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী আসন ছাড় না পাওয়ায় ২০টি আসনে আমাদের পৃথক প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। তারপরও আমরা মনে করছি এর কোনো প্রভাব মহাজোটগতভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে পড়বে না। মহাজোটের অপর শরিক জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, আমরা ১৪৪ আসনে আলাদা প্রার্থী দিয়েছি। আওয়ামী লীগের কাছ থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী আসন ছাড় না পাওয়ায় দলের কথা বিবেচনায় নিয়ে আলাদা প্রার্থী দিতে হয়েছে জাতীয় পার্টিকে।

একই ধরনের অবস্থানের কথা জানিয়েছেন জাসদের সাধারণ সম্পাদক শিরীন আক্তারও। তিনি বলেন, 'আমরা ১৪ দলীয় জোটে থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। দলের কথা বিবেচনায় নিয়ে ৫টি আসনে আমাদেরও প্রার্থী রয়েছে। তারা মশাল মার্কায় নির্বাচন করবে।'

নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি পূরণ না হওয়ায় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করেছিল নবম সংসদের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি ও তার জোট শরিকরা। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির ওই ভোটের আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের ১৫৩ জন। যা নিয়ে দেশে-বিদেশে সমালোচনা তৈরি হয়। একই দাবিতে অনড় বিএনপি 'বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ হিসেবে' একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বলে আসছে।

আলাদা প্রার্থী নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, একাদশ সংসদ নির্বাচনে জোট-মহাজোটের পৃথক প্রার্থিতা নিয়ে আওয়ামী লীগের ভেতরে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তিনি বলেন, জোটে আছে এমন কোনো দল যদি মনে করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা জিতে আসতে পারবে তাহলে আমরা স্বাগত জানাব। আমরা এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে জোট-মহাজোটের কাউকে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। রাজ্জাক বলেন, জোট-মহাজোটের শরিকদলগুলোকে আসন ছেড়ে দিয়ে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারিনি। ফলে তারা প্রার্থী দিয়েছে। বিষয়টি আমরা ইতিবাচক হিসেবেই দেখছি। এ নিয়ে বাড়তি কোনো টেনশন নেই। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বলেন, তারা জোট-মহাজোটে আছে। কিন্তু একক প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বিষয়টিকে আমরা ইতিবাচক হিসেবেই দেখছি। কারণ আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই।

বিজয়ী হলে কে হবেন ঐক্যফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী?

কাওসার আজম

৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নানা নাটকীয়তার পর দলীয় সরকার তথা শেখ হাসিনার অধীনেই অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বিএনপি। এমন এক সময়ে বিএনপি এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে যখন তাদের দলীয় চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতির একটি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে জেল খাটছেন। দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাইরে রয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনিও একাধিক মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত। আইনের চোখে তিনি পলাতকও বটে।

সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পর ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি প্রথম দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচন বিএনপি-জামায়াতসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বর্জন করে। ওই নির্বাচনের আগে ও পরে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে নানা আন্দোলন ও কর্মসূচি পালন করে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল হয়নি সংবিধানে। কিন্তু এরই মধ্যে ঘনিয়ে আসে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়। শেখ হাসিনার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এবং তার অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না-বলে এতোদিন হুঁশিয়ারি দিলেও শেষ পর্যন্ত বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অধীনেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে প্রায় এক যুগ ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি ও তাদের মিত্ররা। সাবেক কিছু প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতাদের দলও যুক্ত হয়েছে বিএনপির নির্বাচনি জোটে।

৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনীতিতে নানা সমীকরণ ঘটেছে। অতীতে যারা নৌকার মাঝি ছিলেন তাদের হাতে উঠেছে বিএনপির ধানের শীষ। অপরদিকে ধানের শীষের কোনো এক সময়ের হেভিওয়েট প্রার্থীরা ধরেছেন নৌকার হাল। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কাছাকাছি সময়ে এক সময়ের প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বিএনপির সঙ্গে আলাদা জোট গড়েছে। এ জোটের শরিক হিসাবে রয়েছে আ স ম রবের জেএসডি, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য। বঙ্গবন্ধু সরকারের আইনমন্ত্রী ও সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড. কামালের দল গণফোরামে যোগ দিয়েছেন শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক আবু সাঈদ, ডাকসুর সাবেক ভিপি ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মো. মনসুর আহমেদ। শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী প্রয়াত শাহ এমএসএম কিবরিয়ার ছেলে ড. রেজা কিবরিয়াও যোগ দিয়েছেন গণফোরামে। গণফোরামে যোগ দেওয়া এসব নেতারা একাদশ সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনি লড়াইয়ে মাঠে নেমেছেন। আদর্শগতভাবে উল্টোপথের যাত্রী হয়ে ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ভোটে অংশ নিচ্ছেন ধানের শীষ মার্কায়।

ড. কামাল হোসেন

অপরদিকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আদর্শে বিশ্বাসী সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন মহাসচিব অধ্যাপক ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর দল বিকল্পধারা উঠেছে শেখ হাসিনার নৌকায়। বদরুদ্দোজার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট বিএনপি জোটে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি যখন প্রায় সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনই আসন বিন্যাসসহ নানা সমীকরণে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী জোটে যুক্ত হয় তারা। বিএনপির এক সময়ের প্রভাবশালী নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সমর্থন দিয়ে আসছেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের প্রতি। বিপরীতমুখী ভিন্ন আদর্শের দলগুলো ভিন্নমুখী জোটে যুক্ত হয়ে আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, আসন্ন নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে নৌকা মার্কায় ভোট করছেন ২৭২ জন প্রার্থী। এদের মধ্যে ২৫৮ জনই আওয়ামী লীগের প্রার্থী। বাকিরা ১৪ দলভুক্ত প্রার্থী। জোটের অন্যতম শরিক দল জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ২৬টি আসন। যারা লাঙ্গল প্রতীকে নির্বাচন করছে। এর বাইরে আরো ১৩২টি আসনে আলাদাভাবে লাঙ্গল প্রতীকে নির্বাচন করছে দলটি। দুটি আসনে বাই সাইকেল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছে আওয়ামী জোটের আরেক শরিক দল আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জেপি।

অন্যদিকে বিএনপির নেতৃত্বে দুটি জোট নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। একটি হলো জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। ঐক্যফ্রন্টে রয়েছে বাম ও প্রগতিশীল কয়েকটি দল। অপরদিকে রয়েছে ২০ দলীয় জোট। এ জোটে রয়েছে জামায়াতসহ ধর্মভিত্তিক বেশ কিছু দল। ২৯৮টি আসনে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন

করছে বিএনপির এই দুই জোট। দুই জোটের শরিকদের জন্য ৫৮টি আসন ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি। জোটের দ্বিতীয় প্রধান শরিক জামায়াত পেয়েছে ২২টি আসন। অন্যদিকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টভুক্ত গণফোরাম, জেএসডি, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ও নাগরিক ঐক্যকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ১৯টি আসন। নির্বাচনে ১৭টি আসন পেয়েছে এলডিপিসহ ২০ দলের আরো কয়েকটি শরিক।

গত ৮ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করেছে। শুরু থেকেই কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশনের প্রতি অনাস্থার জায়গা থেকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দাবী জানিয়ে আসছে বিএনপি জোট। ইসি তাদের জায়গা থেকে কিছু দাবি বাস্তবায়নও করেছে। তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাদের নেওয়া উদ্যোগ যথেষ্ঠ নয় বলে মনে করেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা।

বিএনপি জোট ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সেনা মোতায়েনসহ বিভিন্ন দাবি জানিয়ে আসছে। দাবি তুলেছে ডিসি, এসপি ও ওসিসহ প্রশাসনিক এবং পুলিশে রদবদলের। কিন্তু এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো বদলি হয়নি। সুতরাং নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবে কিনা-তা নিয়ে সংশয় রয়েই গেছে।

৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কোন জোট জিতবে বা সরকার গঠন করবে-তা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু একটি বিষয় দীর্ঘদিন থেকেই আলোচনায় আসছে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসলে ফের প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ হাসিনা। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে জেলে, একাধিক মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘদিন হলো লন্ডনে নির্বাসনে রয়েছেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জিয়া পরিবারের কেউই নির্বাচনি মাঠে নেই। এ অবস্থায় নানা মহলে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে- বিএনপি জোট ভোটে জিতলে কে হবেন প্রধানমন্ত্রী?

তারেক রহমান

মির্জা ফখরুল ইসলাম

সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এমন কি কূটনীতিকরাও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড. কামাল হোসেনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'আপনারা ক্ষমতায় গেলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন?' জবাবে ড. কামাল অবশ্য জবাব দিয়েছিলেন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

কামাল হোসেনের এই জবাবের মধ্যে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে। সে বার্তাটি হচ্ছে- বিএনপি জোট তথা জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোট ক্ষমতায় আসলে বিএনপি থেকেই প্রধানমন্ত্রী হবেন। কেননা এই জোটের প্রধান দল বিএনপি। কিন্তু, এতেও প্রশ্ন রয়েই যায়। বিএনপি থেকেই বা প্রধানমন্ত্রী হবেন কে? বিএনপিপন্থি বুদ্ধিজীবী ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, '৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনে বিএনপি জোট ক্ষমতায় আসবে, ২ জানুয়ারি খালেদা জিয়াকে জেল থেকে বের করা হবে।' যদি তার কথাই ধরে নেওয়া যায় তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। বিএনপি জোট ক্ষমতায় আসার পর ২ জানুয়ারি খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হলেও কী তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন? কারণ প্রধানমন্ত্রী হতে হলে অবশ্যই সংসদ সদস্য হতে হবে। দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তিনি তো এবার নির্বাচনই করতে পারছেন না। ফলে সংসদ সদস্য হওয়ার আগ পর্যন্ত তার তো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এছাড়া দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা তো রয়েছেই।

খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের অবর্তমানে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি তার নিজ এলাকা ঠাকুরগাঁও-১ ছাড়াও প্রার্থী হয়েছেন খালেদা জিয়ার বগুড়া-৬ আসনে। বিএনপি জোটের অনেকে মনে করেন উপ-নির্বাচনে খালেদা জিয়া সংসদ সদস্য পদে জয়ী হওয়ার পর তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। কিন্তু এর আগে তো সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও একজনকে প্রধানমন্ত্রী দিতে হবে। তিনি কে? সংসদ সদস্য পদে বিজয়ী হলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন নাকি মওদুদ আহমদ হবেন খণ্ডকালীন সেই প্রধানমন্ত্রী?

অনেকে আবার মালয়েশিয়াকেও উদাহরণ হিসেবে টানেন। চলতি বছরের শুরুতে মাহাথির মোহাম্মদের নেতৃত্বে দেশটিতে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। যেখানে মাহাথির তার মূল দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে চির শত্রু আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় এসেছেন, হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ওই জোটে আনোয়ার ইব্রাহিমের দলই জোটের প্রধান দল। দীর্ঘ ২২ বছর যে দলের হয়ে মালয়েশিয়ায় প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন সেই দলের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে নেমে পরাজিত করে চমক সৃষ্টি করেন ৯২ বছর বয়সী ড. মাহাথির। মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির কিছুটা মিল রয়েছে। সারা জীবন যারা বিএনপিবিরোধী রাজনীতি করেছেন, তাদের বেশ কিছু শীর্ষনেতা জোট বেঁধে বিএনপি জোটকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে ভোটের মাঠে রয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষনেতা ড. কামাল হোসেন কী তাহলে মাহাথীরের ভূমিকায়..? বিএনপি জোট ক্ষমতায় আসলে তিনি কী স্বল্প সময়ের জন্য হলেও প্রধানমন্ত্রী হবেন? কিন্তু তিনিও তো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না। তাহলে ঐক্যফ্রন্ট থেকেই বা কে হবেন সেই প্রধানমন্ত্রী? নির্বাচনে বিএনপি জোট বিজয়ী হলে এটিই হতে পারে আলোচনার অন্যতম বিষয়। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

ভিক্ষুকদের কাছ থেকেও চাঁদা নেয় সংঙ্ঘবদ্ধ চক্র

রহমান সাঈদ

নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত হিসেবে বিবেচিত হলেও এক শ্রেণির মানুষ ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে পেশাদার ভিক্ষুকের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও এর সংখ্যা কম নয়। শুধু রাজধানীতেই অর্ধলাখ ভিক্ষুক রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েক হাজার নিয়মিত রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে চাঁদা করে বেড়ায়। মজার বিষয় হলো চাঁদা করে বেড়ানো এ ভিক্ষুকরাও এক শ্রেণিকে চাঁদা দেয়! তদারকি বা চাঁদা হিসেবে ভিক্ষুকদের কাছ থেকে নেয়া এ ভিক্ষার মাধ্যমে প্রতিদিন কোটি টাকার ওপরে হাতিয়ে নিচ্ছে একটি সঙ্ঘবদ্ধ চক্র।

প্রতিদিন একজন ভিক্ষুক যে আয় করে তা থেকে ২০০-২৫০ টাকা দিতে হয় চক্রের সদস্যদের। চক্রের সদস্যদের ভিক্ষার টাকা থেকে চাঁদা না দিয়ে রাজধানীতে ভিক্ষা করা সম্ভব না।

বিভিন্ন কৌশলে ভিক্ষুকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চক্রের সদস্যরা তিনস্তরে নিয়ন্ত্রণ করে ভিক্ষার কার্যক্রম ও চাঁদা গ্রহণ। ভিক্ষা পেশায় নিয়োজিতদের মধ্যে থেকে বাছাইকৃত কয়েকজন প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। দ্বিতীয় ধাপে আরও কিছু লোক ভিক্ষুকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে তারা এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর তৃতীয়ধাপে অর্থাৎ সবার ওপরে রয়েছে সর্দাররা।

ভিক্ষুকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকারা ভিক্ষুকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে। সংগৃহীত চাঁদার টাকা সর্দারদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। অন্ধ কল্যাণ সংস্থা, দুস্থ কল্যাণ সংস্থা, পঙ্গু সমাজকল্যাণ সমিতিসহ বিভিন্ন নামে চলে ভিক্ষার এ রমরমা ব্যবসা। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালনকারীদের এসব সংস্থায় সদস্য হিসেবে রাখা হয়। আর সর্দারদের নিয়ে হয় কার্যকরী কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী অথবা উপদেষ্টা পরিষদ। কার্যকরি কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে আছে- সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, পাবলিক সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন পদবী। ভিন্ন পরিচয়ে অন্তত ২০ জন ভিক্ষুকের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মতিঝিল অঞ্চলে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে আছে- মুজিবর, কাশেম, লতিফ। বায়তুল মোকারম মসজিদ এলাকায় আছে- মুক্তার, কাশেম। হাইকোর্ট এলাকায়- মফিজ, সাইফুল ইসলাম, আমিন উদ্দিন, শওকত হোসেন, আগুন, মামুন। শাহজাদপুর-বাসাবো এলাকাতে হাফেজ বিল্লাহ, মো. মোস্তফা। গুলিস্তানে মো. খোকনসহ প্রতিটি অঞ্চলেই আরও কয়েকজন পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে।

রাজধানীর প্রতিটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষক থাকলেও এক অঞ্চলের পর্যবেক্ষকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের পর্যবেক্ষকের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এরা পারস্পরিক সহযোগিতায় নিজ নিজ অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করে। একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করে তাদের সর্দাররাও।

ভিক্ষুকদের নিয়ে রাজধানীর বকশী বাজারে অবস্থিত 'অন্ধ সংস্থা' নামে একটি সংগঠন রয়েছে। এ সংগঠনের সভাপতি পদে রয়েছে নূর আলম সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক আয়ুব আলী হাওলাদার ও

পাবলিক সেক্রেটারি পদে আছে আবু আলী মতবার।

'পঙ্গু সমাজকল্যাণ সমিতি' নামে ভিক্ষুকদের রয়েছে আরও একটি সংগঠন। রাজধানীর ইস্কাটনে এই সংগঠনটির কার্যালয়। তবে সংগঠনের আওতায় থাকা বেশিরভাগ ভিক্ষুকের আড্ডাখানা হাইকোর্ট মাজার এলাকা। মো. আরব আলী সরদার নামে একজন এই সংগঠনটি গড়ে তোলে। বর্তমানে সংগঠনটির নেতৃত্বে রয়েছে- মো. জাকির হোসেন, মো. লিপটন মল্লিক, বাবুল মিয়া, মো. হাবিব, মো. আলী, মো. সালেহ আহমেদসহ আরও কয়েকজন।

অন্ধ সংস্থার পাবলিক সেক্রেটারি আবু আলী মতবার'র সঙ্গে ভিন্ন পরিচয়ে কথা বললে তিনি জানান, তাদের আওতায় এক হাজারের ওপরে অন্ধ আছে। যারা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিক্ষা করে।

৫'শ ভিক্ষুককে খাওয়াতে হলে কি করতে হবে-এমন প্রশ্ন করা হলে আবু আলী মাতবার বলেন, ভিক্ষুকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি দিতে হবে। আর খাওয়ার পাশাপাশি মাথাপিছু ৫০ টাকা করে দিতে হবে।

কথায় কথায় সংগঠনের আওতায় কেউ ভিক্ষুক দিলে তাকে কি ধরনের সুবিধা দেয়া হয় জানতে চাইলে আবু আলী বলেন, বিষয়টি আমি মহাসচিবের সঙ্গে কথা বলে জানাবো। মহাসচিবই বলতে পারবেন কি ধরনের সুবিধা দেয়া হবে।

এরপর সংগঠটির মহাসচিব আয়ুব আলী হাওলাদারের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, কেউ যদি আমাদের সংগঠনের কাছে বাচ্চা দিতে চায় দিতে পারবে। আমাদের কাছে বাচ্চা দিলে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিবো। তার থাকা-খাওয়া সব ফ্রি। এর জন্য কোন টাকা দিতে হবে না।

আর মধ্যবয়সীদের ক্ষেত্রে কি সুবিধা আছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা এখানে থাকলে থাকতে পারবে। এর জন্যও টাকা দিতে হবে না। আমাদের কাছে অনেকেই আছে। সে ভিক্ষা করে আয় করলে কতো টাকা দিতে হবে? এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তার মতো সে থাকবে। কোন টাকা লাগবে না।

এরপর সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে কথা বললে আয়ুব আলী হাওলাদার বলেন, আমাদের সংগঠনের অধীনে কোন লোক থাকে না। কোন অন্ধ বিপদে পড়লে আমরা সহায়তা করি। ঢাকা শহরে আমাদের সদস্য আছে মাত্র ১১৭ জন।

এ সময় তাকে বলা হয় আপনার সংগঠনের পাবলিক সেক্রেটারি জানিয়েছেন আপনাদের অধীনে এক হাজারের ওপরে লোক আছে। উত্তরে তিনি বলেন, পাবলিক সেক্রেটারি এমন কথা বললে বিষয়টি তিনিই জানেন, আমার কিছু জানা নেই।

আপনার সংগঠনের সদস্য মুজিবর, কাশেম ও লতিফ মতিঝিলে ভিক্ষার কার্যক্রম তদারকি করে এমন অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আয়ুব আলী বলেন, ওরা কেউ আমার সংগঠনের সদস্য না।

তবে মতিঝিল অঞ্চলের একাধিক ভিক্ষুক জানিয়েছেন মুজিবর, কাশেম ও লতিফ অন্ধ সংস্থার সদস্য। এদের মধ্যে মুজিবরের সঙ্গে কথা বললেও তিনি বিষয়টি স্বীকার করেন। তবে ঢাকার বাহিরে আছেন জানিয়ে মুজিবর ভিক্ষা নিয়ে কোন কথা বলতে রাজি হননি। তিনি সংগঠনের পাবলিক সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

আয়ুব আলী হাওলাদারের সঙ্গে কথা শেষে আবার আবু আলী মাতবারকে ফোন দেয়া হয়। তবে ফোনটি রিসিভ করেন একজন নারী। তিনি জানান, আবু আলী মাতবার এখন নেই। এরপর আরও কয়েক দফা ফোন করা হলে প্রতিবারই একজন নারী রিভিস করেন এবং আবু আলী মাতবার নেই বলে জানান।

হাইকোর্ট মাজার এলাকায় কথা হয় পঙ্গু সমাজকল্যাণ সমিতির অধীনে ভিক্ষা করা আগুন ও মামুনের সঙ্গে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় কেউ ৫'শ ভিক্ষুক খাওয়াতে চাইলে কিভাবে ভিক্ষুক পাওয়া যাবে। উত্তরে তারা বলেন, একদিনের মধ্যে তারা ৫ হাজার মানুষ জোগাড় করে দিতে পারবে। তবে ভিক্ষুকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি দিতে হবে এবং কিছু টাকা দিতে হবে।

এদিকে ভিক্ষাবৃত্তির আড়ালে এখানে বড় একটি অপরাধী গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বড় বড় সন্ত্রাসী এদের ভেতরে এসে গা ঢাকাও দেয় বলেও জানা গেছে। এমনকি ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়ালেও রাজধানীর প্রতিটি ভিক্ষুকের কাছে রয়েছে মোবাইল ফোন। কেউ কেউ একাধিক মোবাইলও ব্যবহার করে।

এসব ভিক্ষুকদের বড় অংশের আড্ডাখানা হাইকোর্ট মাজার এলাকায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সামনেই চলে সেই আড্ডা। তবে কেউ তাদের কিছু বলে না। হাইকোর্ট মাজার ছাড়াও গুলিস্তানের গোলাপশাহ মাজার, বাইতুল মোকারম মসজিদ, মতিঝিলে অবস্থিত বঙ্গভবন সংলগ্ন মসজিদেও ভিক্ষুকদের আড্ডা দেখা যায়।

ভিক্ষুক কেনা-বেচা :

রাজধানীতে রমরমা ভিক্ষা ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে চলে ভিক্ষুক কেনা-বেচার ব্যবসাও। ভিক্ষা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী চক্রের সদস্যরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই কেনা-বেচার কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। বিভিন্ন দাওয়াতে (ভিক্ষুক, দুস্থ মানুষ খাওয়ানো অনুষ্ঠান) একজন ভিক্ষুক ৫০ থেকে ১শ' টাকায় বিক্রি হয়। এ ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তির জন্যও চলে ভিক্ষুক কেনা-বেচা। এ ক্ষেত্রে চক্রের প্রধান টার্গেটে থাকে শিশুরা।

দুই বছরের ছোট একটি শিশু ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম দিয়ে কিনে নেয় এই চক্র। তবে চক্রটি এ টাকার লেনদেন করে পরিচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে। রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া শিশুদের একটি অংশ এই চক্রের হাতে চলে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

অন্ধ কল্যাণ সংস্থা, দুস্থ কল্যাণ সংস্থা, পঙ্গু সমাজকল্যাণ সমিতিসহ বিভিন্ন নামে চলে ভিক্ষার এ রমরমা ব্যবসা।

মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালনকারীদের এসব সংস্থায় সদস্য হিসেবে রাখা হয়। আর সর্দারদের নিয়ে হয় কার্যকরী কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী অথবা উপদেষ্টা পরিষদ। কার্যকরি কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে আছে- সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, পাবলিক সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন পদবী।

ভিক্ষুক কেনা-বেচা নিয়ে চাঞ্চল্যকর এসব তথ্য দিয়েছেন তাদেরই সদস্য মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন চাকলাদার (ছদ্মনাম) ও রিজিয়া পারভীন (ছদ্মনাম)। তারা জানান, ভিক্ষার জন্য সঙ্গে একটি বাচ্চা দিলে সরদারকে ৫০ টাকা বেশি দিতে হয়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালের তুলনায় বর্তমান রাজধানীতে ভিক্ষুকদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এর সঙ্গে বদলে গেছে ভিক্ষার ধরন। এখন সহজে মানুষ ভিক্ষা দিতে চায় না।

তাই বাচ্চাদের খাওয়ানোর কথা বলে কিংবা বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে আছে এসব বললে ভিক্ষার আবেদন বাড়ে। ভিক্ষার আবেদন বাড়ানোর জন্যই বাচ্চাদের ভাড়া নেওয়া হয়। বাচ্চাদের ভাড়া নিয়ে ভিক্ষা করলে আয় বেশি হয়। ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকায় সরদারদের কাছে বাচ্চা বিক্রি করা যায় বলে তারাই জানান।

ভিক্ষুক সিন্ডিকেটে অপরাধ চক্র :

ভিক্ষাবৃত্তির আড়ালে এখানে বড় একটি অপরাধী গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বড় বড় সন্ত্রাসী এদের ভেতরে এসে গা ঢাকাও দেয় বলেও জানা গেছে। এমনকি ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়ালেও রাজধানীর প্রতিটি ভিক্ষুকের কাছে রয়েছে মোবাইল ফোন। কেউ কেউ একাধিক মোবাইলও ব্যবহার করেন।

এসব ভিক্ষুকদের বড় অংশের আড্ডাখানা হাইকোর্ট মাজার এলাকা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সামনেই চলে সেই আড্ডা। তবে কেউ তাদের কিছু বলে না। হাইকোর্ট মাজার ছাড়াও গুলিস্তানের গোলাপ শাহ মাজার, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, মতিঝিলে অবস্থিত বঙ্গভবন সংলগ্ন মসজিদেও ভিক্ষুকদের আড্ডা দেখা যায়।

২০০০ সালে বহুল আলোচিত সার্জেন্ট আহাদ পারভেজ হত্যার অন্যতম আসামি কাঙালি জাকির 'পঙ্গু সমাজকল্যাণ সমিতি'র সদস্য ছিল। সার্জেন্ট আহাদ ছিলেন অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচীর প্রথম স্বামী।

> রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া শিশুদের একটি অংশ এই চক্রের হাতে চলে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

কাঙালি জাকিরের নেতৃত্বে ২০০০ সালের ২৮ অক্টোবর বঙ্গভবনের পাশের পার্কের সামনের রাস্তায় একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ওই সময় সার্জেন্ট আহাদ পারভেজ ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করেন। এক পর্যায়ে ছিনতাইকারীরা আহাদকে ছুরি মেরে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

পরে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে রাজধানীর গুলিস্তান এলাকা থেকে পুলিশ জাকিরকে গ্রেফতার করে। তবে দুই বছর পর জামিনে বেরিয়ে যায় জাকির। পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালে খিলগাঁওয়ে এক 'বন্দুকযুদ্ধে' মারা যায় কাঙালি জাকির। এরপরই পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় জাকির সার্জেন্ট আহাদ হত্যার প্রধান আসামি।

পুনর্বাসনের সীমিত উদ্যোগ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০১০ সালে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নেয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ২০১০-১১ অর্থবছরে কর্মসূচি খাতে ৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭ কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তবে টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও কর্মসূচির আওতায় খরচ হয়েছে এক কোটি টাকারও কম। জরিপ, আসবাব কেনা এবং ময়মনসিংহ ও জামালপুরে কিছু কার্যক্রম পরিচালনায় এ টাকা খরচ হয়। কর্মসূচির আওতায় ১২ জনকে ১২টি রিকশা, ১৭ জনকে ১৭টি ভ্যান ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য পাঁচ হাজার করে টাকা দেয়া হয়। এ ভিক্ষুকদের সবাই ময়মনসিংহ জেলার। এর পাশাপাশি জেলাটির আরও ৮ জন ভিক্ষুককে পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়। তবে এই ৩৭ জন ভিক্ষুকের মধ্যে ৩০ জন বর্তমানে কোথায় আছে, কী করছে তার কোনো তথ্য নেই সমাজসেবা অধিদপ্তরে। ধারণা করা হচ্ছে, এরা সবাই রিকশা ও ভ্যান বিক্রি করে আবারও ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে গেছে। কর্মসূচির আওতায় ঢাকা শহরে ১০টি বেসরকারি সংগঠনের সহায়তায় ভিক্ষুক জরিপে ১০ হাজার ভিক্ষুকের ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করে ডেটাবেজ তৈরি করা হয়।

তবে ২০১৪ সালের পর এ কর্মসূচির আওতায় তেমন কোনো কাজ হয়নি। এরপর ২০১৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সিলেটে এক অনুষ্ঠানে বলেন, দেশে কোনো ভিক্ষুক নেই বলে বাজেটে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি।

ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে আইন থাকলেও প্রয়োগ নেই:

রাজধানীর ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এমনকি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও ভিক্ষুকমুক্ত নগরী গড়ার কথা বলা হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো রাজধানীকে ভিক্ষুকমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে আইন থাকলেও তার কোনো প্রয়োগ দেখা যায়নি।

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১-তে বলা হয়েছে, 'যে নিজে বা কারও প্ররোচনায় ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত, সে ভবঘুরে হিসেবে বিবেচিত হবে।' এ আইনে ভবঘুরেদের আটক করার বিধান রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৯ (১) ধারায় বলা হয়েছে, 'পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কর্মকর্তা অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, কোনো ব্যক্তিকে ভবঘুরে বলে গণ্য করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হলে, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময় আটক করতে পারবেন।'

আইনে আরও বলা হয়েছে, ভবঘুরেকে আটকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করতে হবে। আর আটককৃত ব্যক্তি ভবঘুরে হলে ম্যাজিস্ট্রেট যেকোনো আশ্রয়কেন্দ্রে কমপক্ষে ২ বছর তাকে আটক রাখার জন্য বা আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেবেন। এই আইনে বলা হয়েছে, যদি আশ্রয়কেন্দ্র থেকে কেউ পালায় তবে সে কমপক্ষে ৩ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কিন্তু আইনের কোন বাস্তবায়ন নেই।

ইউটিউবের পেটে গান-নাটক-সিনেমা

রহমান পাভেল

সময়ের বিবর্তনে অনলাইন দুনিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বিভিন্ন ভিডিও স্ট্রিমিং প্লাটফর্ম। সিডি, ক্যাসেট প্লেয়ার এখন শুধুই অতীত। টেলিভিশনও হারাতে বসেছে তার গৌরবময় ঐতিহ্য। ইউটিউব হয়ে উঠেছে গান, নাটক ও সিনেমা প্রকাশ ও প্রচারের বড় মাধ্যম। শুধুমাত্র ইউটিউবে প্রকাশের জন্যই এখন নির্মিত হচ্ছে সিনেমা, নাটক এবং নানা রকম ভিডিও কন্টেন্ট। ইউটিউবের আধিপত্যে কোনঠাসা এখন টেলিভিশন মাধ্যম। অন্যদিকে গানের সঙ্গে ভিডিও নির্মাণ যেন এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ইউটিউবের মাধ্যমে মুহূর্তেই গান-ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে। কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে এক দেশের সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা সহজেই দখল করে নিচ্ছে অন্য দেশের বাজার। অন্তর্জাল দুনিয়ার এই আধিপত্য যেমন ইতিবাচকভাবে দেখছেন অনেকে, আবার নেতিবাচক অনেক দিকও রয়েছে বলে মন্তব্য করছেন বিশিষ্টজনেরা।

ইউটিউবের এমন জনপ্রিয়তার নেপথ্যে রয়েছে অর্থ উপার্জনের হাতছানি। এমনটাই মনে করছেন ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে কাজ করা কে এম মুত্তাকী। তিনি বলেন, 'নাটক-সিনেমা-গান-ভিডিও ইউটিউবে প্রকাশ করার ফলে দ্রুত মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে, আবার ইউটিউব থেকেই অর্থ আয়েরও সুযোগ তৈরি হয়েছে। যে কারণে ইউটিউব হয়ে উঠেছে জনপ্রিয় প্লাটফর্ম। ইউটিউবকে কেন্দ্র করে নেটফ্লিক্সের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও বঙ্গবিডি, বাংলালিংক ভাইব, গ্রামীণফোন ডিজিটালেরও মতো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।'

সম্প্রতি 'বাংলালিংক ভাইব' নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে মুঠোফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক। এতে থাকছে বাংলাদেশি শিল্পীদের গাওয়া তিন লাখ বাংলা গান। বাংলালিংকের হেড অব ই-প্রোডাক্টস অনিক ধর জানান, এই অ্যাপে চলচ্চিত্র, আধুনিক গান, ব্যান্ড, লোকগান, পঞ্চকবির গানসহ সব ধরনের গানই থাকবে। দেশের বাইরের শিল্পীদের গানও থাকছে। সব মিলিয়ে এই অ্যাপে মোট গানের সংখ্যা হবে ১০ লাখ।' অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং প্লাটফর্মকে সঙ্গীতের জন্য বড় আর্কাইভ বলে মনে করছেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হক। তিনি বলেন, 'এখন ইউটিউবে সহজেই গান সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। কিন্তু এই মাধ্যমটি সহজলভ্য হবার কারণে অনেকেই মানহীন গানও প্রকাশ করছেন ইউটিউবে। ফলে ভালো গানটি খুঁজে নিতে সমস্যায় পড়তে হয়। তবে শুদ্ধ সঙ্গীতকে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অনলাইন মাধ্যমগুলো ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু আমরা দেখছি, শুদ্ধ সঙ্গীতের চাইতে মানহীন সঙ্গীতই এখন অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পাশাপাশি এখন শুদ্ধ সঙ্গীতও সহজেই অনলাইনে পেয়ে যাচ্ছি। এটা ইতিবাচক দিক। তাই অনলাইন মাধ্যমকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করাটা জরুরি।'

এদিকে ইউটিউবে বেশি দর্শক তৈরি করার মধ্য দিয়ে অর্থ আয়ের সুযোগকে কাজে লাগাতে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে মিউজিক ভিডিও নির্মাণের। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বেশ কয়েকজন সঙ্গীত শিল্পীর নতুন গানের ভিডিও নির্মাণ হয়েছে, যেগুলোর বাজেট ১৫ লাখ টাকার বেশি। বিগ বাজেটের এই গানগুলোর ভিডিওতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, লোকেশন, সুন্দরী নারী মডেল কিংবা জনপ্রিয় তারকাকে। যার মধ্য দিয়ে গানটি অনলাইন দুনিয়ায় জনপ্রিয় হবে। কেউ কেউ গান হিট করানোর জন্য মিউজিক ভিডিওতে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষক লিনা তাপসী খান বলেন, 'গান হচ্ছে শ্রবণের বিষয়, যা কান দিয়ে হৃদয়ে পৌঁছায়। গান কেন দেখার বিষয় হয়ে উঠবে? তাহলে আমার কল্পনার জগৎটা কোথায়? আমি যখন বই পড়ি তখন কল্পনায় চরিত্রগুলোকে যেভাবে সাজাই পরে ভিডিও চিত্রে সেই চরিত্রের কিছু কিছু দেখে আশা ভঙ্গ হয়। আমি যখন গান শুনি তখন যা ভাবি বা কল্পনাতে সাজাই তা যদি মিউজিক ভিডিওতে বন্দি করা হয় তাহলে আমার কল্পনার জগৎটা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে বেরিয়ে নতুন কল্পনা করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। সব কিছুর ভিডিও না হওয়াটাই ভালো। আর ভিডিও নির্মাণের জন্য চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী একটা শিল্পমাধ্যম তো আছেই।'

শুধু সঙ্গীত নয়, টেলিভিশন নাটকের বাজারও দখল করে নিয়েছে ইউটিউব। এখন বিভিন্ন ভিডিও স্ট্রিমিং প্লাটফর্মেই প্রচার করা হচ্ছে খণ্ড নাটক, ধারাবাহিক নাটক। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও পর্দায় প্রচারের পরই তাদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে তুলে দিচ্ছে নাটক। এতে করে দর্শক এখন টেলিভিশনে নাটক দেখছে কম, ইউটিউবেই দেখছে বেশি। এ প্রসঙ্গে তরুণ নাট্যনির্মাতা হাসান রেজাউল বলেন, 'টেলিভিশনে নাটক প্রচারের কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেটি যখন ইউটিউবে প্রচার হয়ে যাচ্ছে তখন দর্শক আর টেলিভিশনে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে না। এতে করে দর্শক কিন্তু টেলিভিশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বিভাগই কিন্তু দর্শককে ইউটিউবের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইউটিউবে নাটক প্রচারের ফলে অনেক বেশি দর্শক সেটি দেখছে, এটা যেমন সত্য। আবার এটাও সত্য যে, দর্শক টেলিভিশনের পর্দা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর নির্মাতা হিসেবে আমি বলবো, ইউটিউবে নাটক প্রচারের কারণে নির্মাতাদের কোনো লাভ হয় না। কারণ নাটক যখন টেলিভিশন চ্যানেলের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়, তারপর পুরো বিষয়টি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের। তারা ইউটিউবে আপলোড করতে গিয়ে সেখান থেকে কিছু আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। নির্মাতাদের জন্য এটুকু অনেক বেশি পজেটিভ যে, ইউটিউবে অনেক বেশি দর্শক নাটকটি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। টেলিভিশনের চাইতে অনেক বেশি দর্শক নাটকটি ইউটিউবে দেখছেন।'

ইউটিউবে নাটক দেখার আনন্দটা অন্যরকম বলে মনে করেন নাট্যকার

অপু মেহেদী। তিনি বলেন, 'টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন যন্ত্রণার কারণে তো নাটকই দেখা যায় না। নাটকের সময়ব্যাপ্তি যদি থাকে ৪০ মিনিট, সেখানে ২৫ মিনিটই বিজ্ঞাপন প্রচার হয়। ইউটিউবে একসঙ্গে বসে পুরো নাটক দেখা যায়। তাই টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে নাটক প্রচারের সময় বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। না হলে, দর্শক ইউটিউবেই নাটক দেখবে। এতে করে ইউটিউব কেন্দ্রিকই নাটক নির্মিত হবে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দর্শক হারাবে।' বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভির অনুষ্ঠান প্রধান দেওয়ান শামসুর রকিব এই প্রসঙ্গে বলেন, 'তরুণদের মধ্যে ইউটিউব দেখার প্রবণতা বেশি। কিন্তু পরিবারের বাবা-মা বা বয়স্ক যারা তারা কিন্তু টেলিভিশনেই নাটক দেখছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা হওয়া জরুরি।' ইউটিউবে প্রচারের ফলে টেলিভিশনের পর্দায় নাটকের দর্শক কমছে বলে মনে করেন আইটি বিশেষজ্ঞ ইশতিয়াক আহমেদ রাসেল। তিনি বলেন, ইউটিউবে নাটক প্রচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ফলে টিভি চ্যানেলগুলো এখন তাদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে নাটক প্রচার করছে। এতে করে দর্শক টিভি পর্দা থেকে ইউটিউবে চলে যাচ্ছে। আর ইউটিউবে নাটক দেখার সময় বিজ্ঞাপন যন্ত্রণা নেই। কিন্তু টিভিতে একটু পরপরই বিজ্ঞাপনের কারণে নাটক দেখে বিরক্ত হন দর্শক। এখনতো শুধু ইউটিউবে প্রচারের জন্যই নাটক এবং বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। আবার ইউটিউবে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি ভিউয়ার বেশি হওয়ার ওপর নির্ভর করে। ফলে ভিডিও নির্মাণের ক্ষেত্রে 'দর্শক হিট' ব্যাপারটি নির্মাতাদের মাথায় বেশি কাজ করে। যার ফলে অনেক আজে-বাজে ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবে প্রচার করা হচ্ছে। ইউটিউব এখন বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভিডিও দেখার প্লাটফর্ম। এই প্লাটফর্মকে ভালো কিংবা মন্দভাবে ব্যবহার করাটা আমাদের চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সঙ্গে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রলোভন। এসব বিষয় মাথায় রেখে ইউটিউবকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তার নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা যাবে কিনা? সেটা নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

অন্তর্জাল দুনিয়ার সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় ধারণা ওয়েব সিরিজ। ধারাবাহিক ওয়েব সিরিজ নির্মাণ এখন জনপ্রিয়তা পেয়েছে পুরো বিশ্বে। বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে ওয়েব সিরিজ নির্মাণ। সিনেমা কিংবা টেলিভিশন মাধ্যমের অনেক তারকা এখন অভিনয় করছেন ওয়েব সিরিজে। সময়ের আলোচিত নায়িকা পরীমণি, পপি, আঁচল থেকে শুরু করে অপি করিম, সাবিলা নূর, তাহসান, জোভান- অনেকেই এখন অভিনয় করছেন ওয়েব সিরিজে। গিয়াস উদ্দিন সেলিম, অমিতাভ রেজার মতো গুণী নির্মাতারা ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করছেন। সিনেমার তারকারা কেন ওয়েব সিরিজে? এমন প্রশ্নের জবাবে চিত্রনায়িকা পপি বলেন, 'সময়ের সাথে তো চলতেই হবে। এটা এই সময়ের নতুন মাধ্যম। দর্শক এই মাধ্যমটিকে গ্রহণ করছে। আর আমরা তো দর্শকের জন্যই কাজ করি। একটা ভালো কাজ করতে পারলে সেটাকে দর্শকের দরজায় নিয়ে যেতে চাই। ওয়েব সিরিজ দর্শকের কাছে এখন জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আমি মনে করে সিনেমার পাশাপাশি ওয়েব সিরিজে কাজ করাটা দোষ নয়।'

চিত্রনায়িকা পপি এখন 'ইন্দুবালা' নামের একটি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করছেন। ইন্দুবালা ওয়েব সিরিজে আরও অভিনয় করছেন নায়িকা আঁচল। অনেকদিন ধরেই সিনেমার কাজে নেই এই নায়িকা। আঁচল বলেন, 'আমাদের সিনেমার বাজেট দিনে দিনে কমছে। কম বাজেট দিয়ে ভালো সিনেমা হয় না। আর সিনেমাহলেরও সংকট। ফলে একটা ভালো সিনেমা নির্মিত হলেও সেটা খুব বেশি সিনেমাহলে মুক্তি দেয়া যায় না। সেখানে ওয়েব সিরিজ একটা মুক্ত মাধ্যম। এই মাধ্যমে কাজ করলে দর্শক সহজেই দেখতে পারছে। বিশ্বব্যাপী এখন ওয়েব সিরিজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমিও এই মাধ্যমটিতে কাজ করে আনন্দ পাচ্ছি।' কিছুদিন আগেই গিয়াস উদ্দিন সেলিমের পরিচালনায় 'স্বপ্নজাল' সিনেমার মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছেন পরীমণি। এই নায়িকা এবার সেলিমের পরিচালনায় 'প্রীতি সমাচার' নামের একটি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করছেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা উপন্যাস নিয়ে ১২ পর্বের ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করবেন হিমেল আশরাফ। এতে লাবণ্য চরিত্রটিতে অভিনয় করবেন সময়ের গ্ল্যামারাস চিত্রনায়িকা পরীমণি। এই নায়িকা বলেন, 'ভালো কাজ করতে চাই, সেটা সিনেমাই হতে হবে এমন নয়। ওয়েব সিরিজ যদি ভালো গল্প, ভালো নির্মাণ হয়। কাজ করতে সমস্যা তো নেই।' অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ায় নির্মিত হয়েছে 'আঘাত' নামের ১০ পর্বের একটি ওয়েব সিরিজ। এতে অভিনয় করছেন বিপাশা কবির ও দিপালী। বিপাশা কবির বলেন, 'ওয়েব সিরিজ এখন জনপ্রিয় মাধ্যম। দর্শক এটাকে গ্রহণ করছে।' নবাগত নায়িকা জলির অভিষেক হয়েছিল জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত সিনেমার মাধ্যমে। কিন্তু সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। জলি এবার অভিনয় করছেন 'ফোন এক্স' নামে ১২ পর্বের একটি ওয়েব সিরিজে। এখানে প্রধান চরিত্রে আছেন জলি। এই সিরিজের প্রতিটির ব্যাপ্তি ২০-৩০ মিনিট। সব মিলিয়ে অনলাইন দুনিয়ায় ওয়েব সিরিজ যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছে, আবার ওয়েব সিরিজে অশ্লীলতার অভিযোগও উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু ওয়েব সিরিজে দেখে গেছে যৌন সুড়সুড়ি দেয়া রগরগে দৃশ্য।

ডিজিটাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ কেএম মুস্তাকী বলেন, 'অনলাইনে যেহেতু সেন্সরশিপ শুধুমাত্র ইউটিউবের হাতে, তখন শুধুমাত্র ইউটিউব কিছু ভিডিওকে বাতিল করতে পারে। এছাড়া যেকেউ কেউ ভিডিও প্রকাশ করতে পারে। যার জন্য দর্শক টানার উদ্দেশ্যে অনেক সময় ওয়েব সিরিজের নামে এক ধরণের যৌন সুড়সুড়ি দেয়া ভিডিও নির্মাণ করা হচ্ছে। সেগুলোর ভিউ বাড়ছে, অর্থ উপার্জনও হচ্ছে। কিন্তু মান কমছে ওয়েব সিরিজের। আবার বিশ্বজুড়ে অনেক বিগ বাজেটের মানসম্পন্ন ওয়েব সিরিজও কিন্তু প্রচার হচ্ছে অন্তর্জাল দুনিয়ায়।'

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ বলেন, 'এখন বিশ্বায়নের যুগ। অনলাইনের বিকাশের ফলে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে সহজেই আধিপত্য তৈরি করে নিচ্ছে। আবার অপসংস্কৃতিও প্রবেশ করছে। অনলাইন মাধ্যমগুলো এখন আমাদের গান-নাটক-সিনেমাসহ সমস্ত শিল্প মাধ্যমকে এক ধরণের চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আবার সুবিধাও করে দিয়েছে। আমরা এখন যেমন সহজেই আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি। আবার মানহীন কিছু করে নিজের সংস্কৃতিকে অপমানও করতে পারি। এর জন্য আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সময়কে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে হবে। অনলাইন দুনিয়ার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে মানবিক পৃথিবীর জন্য কাজ করতে হবে।'

আয় কমেছে সাধারণ মানুষের

আলমগীর শাহ

ঘর থেকে বেরুলেই খরচ। তাই বের হওয়ার আগেই আপনাকে সাধ্যের মধ্যে সম্ভাব্য খরচার একটা হিসাব কষতেই হয়। অথচ আপনার বাড়তি আয় যোগ হবে-এমন নিশ্চয়তা একদমই নেই। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের আয়ের উৎস হয় স্থির, না হয় নিম্নগতির। কিন্তু ব্যয়ের চাকা সীমাহীন উর্ধ্বগতির।

এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে নিম্নমধ্যম আয়ের বাংলাদেশে। গত এক দশকে দেশের কর্মসংস্থান, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রিজার্ভ, রেমিটেন্স, আমদানি-রফতানিসহ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনধারনে প্রয়োজনীয় সবধরনের ভোগ, সেবা এবং ব্যবহার্য্য পণ্যের দামও বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ফলে এই সময়ে মানুষের যে হারে আয় বেড়েছে, জীবনযাত্রায় ব্যয় বেড়েছে তার চেয়ে বেশি। অর্থাৎ নিম্নবিত্তের আয়ের বাড়তি অংশটি খেয়ে ফেলছে জীবনযাত্রার অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির গতি। এ কারণে পরিকল্পিত হিসাব কষেও অনেকে মাস পেরোতে পারছেন না।

যদিও ২০০৮ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গত দশ বছরে সব সামাজিক সূচক উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৪৯ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে, দেশের মাথাপিছু আয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৭০৩ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। তবে মাথাপিছু হিসাবে আয় বাড়লেও সার্বিক অর্থে সবার আয় সমানভাবে বাড়েনি। সামাজিক শ্রেণি কাঠামো অনুযায়ী উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষের আয়ে বেশ হেরফের রয়েছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সৃষ্ট বহুমাত্রিক বৈষম্যই এর জন্য দায়ী বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ কারণেই আয় বাড়া সত্ত্বেও ব্যয়ের সক্ষমতায় টানাপোড়েন চলছেই। ফলে আশানুরূপ আয় না বাড়ায় মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সঞ্চয়ের প্রবণতাও আশানুরূপহারে বাড়ছে না।

বৈষম্যের মধ্যে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। দেশের কর ব্যবস্থা জনবান্ধব ও দারিদ্র্যবান্ধব না হয়ে অনেকটাই ধনীবান্ধব। প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের প্রবণতা বেশি হওয়ায় নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের উপর এর অভিঘাত বেশি পড়ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ বাজারে গুটিকয়েক ব্যক্তি ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য, ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা অর্জনের প্রবণতা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আওতাভূক্ত পরিষেবাসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় সুশাসনের অভাবের কারণে সম্পদের সুষম বন্টন না হয়ে তা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ছে। ফলে মাথাপিছু আয় বাড়ার সুফল মানুষ খুব কমই পাচ্ছে।

এ অবস্থায় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হলেও তা মানুষের জীবনযাত্রার আয় ও মান বাড়াচ্ছে না। পণ্য ও সেবার মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে প্রকৃত বিচারে মানুষের আয় কমছে। ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১০ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে ২ শতাংশ আয় কম হয়েছে। যার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে।

সরকারি জরিপ বলছে, ২০১০ সালে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২৩১৮ কিলোগ্রাম, ২০১৬ সালে তা কমে ২২১০ কিলোগ্রামে দাঁড়িয়েছে। টাকার অঙ্কে পরিবারপ্রতি প্রকৃত খরচ করার ক্ষমতা বা ভোগ্য ব্যয় কমেছে ১১ শতাংশ।

অর্থনৈতিক তৎপরতায় আয়ের সঙ্গে সঞ্চয়, সঞ্চয়ের সঙ্গে বিনিয়োগ, বিনিয়োগের সঙ্গে কর্মসংস্থানের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এদের প্রত্যেকের সঙ্গে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কে ঘাটতির কারণে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় দুটোই কমছে। আবার বৈষম্যের কারণে বিদ্যমান অর্থনীতিতেই কিছু মানুষের সঞ্চয় বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু নানা কারণে তা বিনিয়োগে আসছে না। টাকা পাচারের প্রবণতাও বাড়ছে। এসবের কারণে দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হলেও সে অনুপাতে কর্মসংস্থান না বাড়ার কারণে দেশে বেকারত্বের বোঝা কমছে না। চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে না। বিশেষ করে ১৫-২৯ বছর বয়সী যুবকেরা বেশি বেকারত্বের শিকার। চাকরি না থাকলে তাদের কাছে আয় আশা করা অনুচিত। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫-৬৫ বছরের কর্মক্ষম জনশক্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এ শ্রেণির বেকারের সংখ্যাও কম নয়। আবার যারা চাকরিতে আছেন তারা বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত।

এদের না আছে উপযুক্ত মজুরি, না আছে অধিকার। ফলে আয় বাড়ানোর সুযোগও কম।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপের তথ্যমতে, জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের আয় হয় কমেছে বা এক জায়গাতেই স্থির আছে। বিপরীতে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের আয় বেড়েছে। এটা ২০১০ সালে ছিল ২৪ দশমিক ৬১, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৮৯ শতাংশে। একইভাবে শীর্ষ ১০ শতাংশ ব্যক্তির আয় ৩৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ দশমিক ১৬ শতাংশে।

এদিকে দেশে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার নেপথ্য অনুসন্ধানে গেছে, বাংলাদেশের একজন উচ্চবিত্ত বা ধনী মানুষ পণ্য কিনতে যে হারে ভ্যাট দেন, একজন শ্রমিক বা নিম্ন আয়ের মানুষও একই হারে ভ্যাট দেন। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ হাজার ১০০ ধরনের পণ্য আমদানি হয়। যেখানে ভ্যাট দিতে হয়। এর বাইরে দেশীয় উৎপাদিত ও বাজারজাতকারী সিংহভাগ পণ্যেই ভ্যাট ধার্য রয়েছে। অর্থাৎ দেশে এখন গুটিকয়েক নিত্যপণ্য ছাড়া বাকি সব খাদ্যপণ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার উপকরণ, চিকিৎসাসামগ্রী, গ্যাস-বিদ্যুৎসহ সব ধরনের ভোগ, সেবা এবং বিনোদনে চেপে বসেছে পরোক্ষ করের খড়্গ। এমনকি মোবাইল ফোনে কথা বলতেও ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট গুনতে হচ্ছে।

জীবনযাত্রার ব্যয় কিভাবে বাড়ছে সেটি খুব সহজেই ধরা পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাসে চড়লেই ন্যূনতম ১০ টাকা ভাড়া দিতে হচ্ছে। এই দূরত্বে রিকশার জন্য দিতে হচ্ছে কমপক্ষে ৪০ টাকা। সিএনজিতে ১২০ টাকার নিচে ভাড়া বলাটাও শোভন মনে করা হয় না। যদিও বছর কয়েক আগেও এসব সেবা যথাক্রমে দুই টাকা, ১৫ টাকা এবং ৫০-৬০ টাকায় ভোগ করা সম্ভব হতো। ধরুণ ক্ষুধা পেয়েছে, আপনি অল্পতেই সারতে চান। এক্ষেত্রে দুই টাকার পাউরুটি এখন খেতে হচ্ছে ৮-১০ টাকায়। এক টাকার বিস্কুট ৩ টাকায়। এক গ্লাস খোলা পানি এক টাকা এবং ছোট বোতলজাত পানির জন্য গুণতে হচ্ছে ১৫ টাকা। একইভাবে স্বাস্থ্যসেবার জন্য ৫ টাকার টিকিট ৩০ টাকা এবং চিকিৎসকের ২০০ টাকার ভিজিট ৮০০-১০০০ টাকা। ২০ টাকা পাতার ওষুধ ৬০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে কলেজ শিক্ষার্থী শাহাদাত হোসেন বলেন, 'শিক্ষা ব্যয় মেটাতে আমার বাবুর্চি বাবার মাসে খরচ হয় ৬৫০০ টাকা। এরমধ্যে ৪০০ টাকাই ভ্যাট। তিন বছরে বাসের ভাড়া বেড়েছে প্রায় আড়াইগুণ। সবমিলিয়ে সেবা পেতে এবং ভ্যাটের কারণে বছরে সাড়ে নয় হাজার টাকা অতিরিক্ত গুনতে হয় আমার পরিবারকে। অথচ আমার পরিবারের আয় সেই অনুপাতে বাড়ছে না। ফলে শিক্ষা ব্যয় মিটাতে আমার পরিবারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।'

ফজলুর রহমান নামে একজন নাগরিক বলেন, সরকার পণ্য উৎপাদনকারীদের উপর ভ্যাট বা ট্যাক্স বাড়ালে তারা তাদের পণ্যের দাম বাড়িয়ে তা সমন্বয় করেন। ফলে বাড়তি টাকাটা শেষমেষ সাধারণ মানুষের পকেট থেকেই যায়। আবার সেই পণ্য কিনতে গিয়ে আরও ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট দিতে হয় সেই সাধারণ মানুষদেরই। সুপারশপে কিনলে আরো ৪ শতাংশ যোগ হয়। ফলে একদিকে যেমন বৈষম্য বাড়ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচও বাড়ছে। এর প্রভাব পড়ছে আয়ের অবশিষ্টাংশ সঞ্চয়ে।

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর রাজধানী ঢাকায় সংগৃহীত বাজার দর ও বিভিন্ন সেবা সার্ভিসের তথ্য থেকে দেখা যায়, ২০১৭ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও পণ্যমূল্য ও সেবা-সার্ভিসের মূল্য বেড়েছে ৭ দশমিক ১৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১৬ সালে এই বৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৬ দশমিক ৪৭ শতাংশ এবং ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ। ২০১২ সালে জীবনযাত্রার এই ব্যয় বেড়েছিল শতকরা ৬.৪২ ভাগ এবং পণ্য ও সেবামূল্য বেড়েছিল শতকরা ১৩.০০ ভাগ।

২০১৮ সালের পর্যালোচনা

সূচক	মানদণ্ড	বাংলাদেশ	মিয়ানমার	লাওস
মাথাপিছু আয় (ডলার)	১২৩০	১২৭৪	১২৫৫	১৯৯৬
মানবসম্পদ	৬৬ বা তার বেশি	৭৩.২	৬৮.৫	৭২.৮
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা	৩২ বা তার কম	২৫.২	৩১.৭	৩৩.৭

সূত্র : সিডিপি, জাতিসংঘ

ফেরত আসছে না ব্যাংক খাতের খোয়া যাওয়া টাকা

শেখ শাফায়াত হোসেন

খেলাপি ঋণে ডুবতে বসেছে দেশের ব্যাংক খাত। ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধের কোন বালাই নেই ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের। নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে তার একটি বড় অংশই বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। ঋণের নামে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে লুটপাটের মহোৎসব চলছে। সম্প্রতি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে, গত এক দশকে ব্যাংক খাতে সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি ও বাংলাদেশ ব্যাংক মিলিয়ে মোট ১৪টি ব্যাংক থেকে এ অর্থ লোপাট হয়েছে। তবে এ অর্থ লোপাটের প্রকৃত পরিমাণ আরও বেশিও হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ব্যাংক খাতে বড় লুটপাট হয়েছে ঋণের নামে। কোনো কোনো ব্যবসায়ী গ্রুপকে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ দিয়েছে কিছু ব্যাংক। এতো টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে হিমশিম খেয়ে এখন তাদের অনেকে খেলাপি হয়ে পড়েছে। কিছু গ্রুপ আর টাকা পরিশোধ করতে পারবে না, এমনটা ভেবে ব্যাংক ওই গ্রাহকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। কিছু বড় প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একের পর এক ঋণগুলো নবায়ন করে সময় ক্ষেপণ করছে। কেউ কেউ রিট মামলা করে খেলাপি হওয়া থেকে বিরত থাকছে।

সিপিডির তথ্যমতে, গত ১০ বছরে জনতা ব্যাংক থেকে অ্যাননটেক্স, ক্রিসেন্ট ও থারমেক্স গ্রুপ মিলে ১১ হাজার ২৩০ কোটি টাকা হাতিয়েছে। এদের মধ্যে অবশ্য অ্যাননটেক্স ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা আছে বলে দাবি করেছে। ক্রিসেন্ট ও থারমেক্স গ্রুপ কিছুটা বেকায়দায় রয়েছে। তবে এই দু'টি গ্রুপ থেকে কিছু টাকা অবশ্যই আদায় হবে বলে আশা করছে জনতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু বেসিক ব্যাংক থেকে বের সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা আর ফেরত আসবে কিনা-এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক নিয়ে গেছে ৩ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা। বিসমিল্লাহ গ্রুপ নিয়েছে ১ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা। এই টাকা ফেরত আসবে না জেনেই সোনালী ব্যাংক ওই ঋণ খেলাপিতে পরিণত করে ইতোমধ্যে অবলোপনও (রাইট অফ) করেছে।

এ ছাড়া রিজার্ভ চুরির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে খোয়া গেছে ৬৭৯ কোটি টাকা। এরমধ্যে অবশ্য ১২৬ কোটি টাকার মতো ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া নতুন প্রজন্মের এনআরবি কমার্শিয়াল ও ফারমার্স ব্যাংক থেকে লোপাট হয়েছে ১ হাজার ২০১ কোটি টাকা। এবি ব্যাংক থেকে পাচার হয়েছে ১৬৫ কোটি টাকা। এই ঋণগুলোর মধ্যে কতো টাকা ফেরত আসবে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এমন আরো অনেক ঋণ খেলাপি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ব্যাংক খাতে। গত ১২ সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে ঋণ খেলাপি গ্রাহকদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এসময় তিনি জানান, ঋণ খেলাপির সংখ্যা দুই লাখ ৩০ হাজার ৬৫৮ জন। এদের কাছ থেকে অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা। ৮৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই ঋণ নেয়া হয়।

তবে এই পরিমাণ খেলাপি ঋণ পুরোটাই যে গত ১০ বছরে নেওয়া হয়েছে এমনটা বলেননি অর্থমন্ত্রী। এরমধ্যে এর আগের ঋণও থাকতে পারে। তবে ১০ বছর আগে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিলো মাত্র ২২ হাজার ৪২১ কোটি টাকা। সেই হিসেবে গত ১০ বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ১ লাখ ৯ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা অবলোপন করাও হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৯৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। তবে ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, এই তথ্যই সঠিক নয়। ব্যাংকগুলো সবসময়ই প্রভিশন কম রাখতে খেলাপি ঋণ লুকাতে চেষ্টা করে।

ঋণ ছাড়াও চেক জালিয়াতি, পাসওয়ার্ড হ্যাক বা এটিএম কার্ড জালিয়াতি, ব্যাংক ডাকাতি বা চুরি এমন অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়েও ব্যাংক খাত থেকে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে গেছে। ২০১৪ সালে কিশোরগঞ্জে সোনালী ব্যাংকের শাখায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ১৬ কোটি টাকার বেশি চুরির ঘটনা ঘটে। পরে অবশ্য ওই টাকা উদ্ধার করা হয়। ২০১৬ সালে এটিএম বুথে স্কিমিং ডিভাইস বসিয়ে ২০ লাখ টাকা তুলে নেয় বিদেশি একটি চক্র। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ক্লোন কার্ড তৈরি করে ২০ লাখ টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনার পর সুপার শপ 'স্বপ্নের' এক কর্মীকে গ্রেফতারও করা হয়।

এমন অনেক ভাবেই ব্যাংকের টাকা খোয়া যাচ্ছে, যার বেশিরভাগই

ফেরত আসছে না। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সময় এসেছে এ নিয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশ করে এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তারা আরো বলছেন, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অনেক কারণেই গ্রাহক খেলাপি হতে পারে। প্রতিটি অর্থনীতিতেই কিছুটা খেলাপি ঋণ থাকে। দেশে খেলাপি ঋণ এখন ১১.৫৪ শতাংশ। ভারতে খেলাপি ঋণ ৯ শতাংশের ঘরে, নেপালে ৩ শতাংশের ঘরে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে চীনের খেলাপি ঋণ ছিলো ১.৭৪ শতাংশ, শ্রীলংকার খেলাপি ঋণের হার ছিলো ২.৫০ শতাংশ এবং থাইল্যান্ডের খেলাপি ঋণের হার ছিলো ৩.০৭ শতাংশ।

শ্রীলংকা ও চীনসহ অনেক দেশেই খেলাপি ঋণ তিন শতাংশের ঘরে। ব্যাংকখাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রকৃত খেলাপি গ্রাহককে তারা সুদ মওকুফসহ অনেক ধরনের সুবিধা দিতে রাজি। কিন্তু ইচ্ছাকৃত বা স্বভাবজাত খেলাপিরা এ ধরনের ছাড় দেওয়া ঠিক হবে না। বরং তাদেরকে আলাদা করে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।

বেসরকারি ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক মঈনউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমি প্রায় ৫ বছর মুম্বাইতে ছিলাম। তখন দেখেছি ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ খেলাপিদের দুইভাগে বিভাজন করে। এক ভাগ ইচ্ছাকৃত খেলাপি, অন্য ভাগ অনিচ্ছাকৃত খেলাপি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যবসায় মন্দাসহ অনেক কারণেই গ্রাহক খেলাপি হতে পারে। যারা ইচ্ছাকৃত খেলাপি তাদের সঙ্গে ওই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর আচরণ করে। অনিচ্ছাকৃত খেলাপিদের ক্ষেত্রে থাকে কিছুটা নমনীয়। দীর্ঘদিন ধরেই আমি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এ ধরনের একটি নীতিমালা করার তাগিদ দিয়ে আসছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো কিছু দেখতে পাইনি।'

বিশ্বের অনেক দেশেই এখন ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের পাসপোর্ট জব্দ করা হয়, যাতে তারা অন্য দেশে চলে যেতে না পারে। আবার কোনো কোনো দেশে ঋণ খেলাপিদের বিলাসবহুল জীবনযাপনে নিরুৎসাহিত করা হয়।

এশিয়ার মধ্যেই এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। গত নভেম্বরে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আয়োজিত বার্ষিক ব্যাংকিং সম্মেলনে উপস্থাপিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, চীনের সর্বোচ্চ আদালত সে দেশের ঋণ খেলাপি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলো। ২২ লাখ ২০ হাজার ঋণ খেলাপিকে উচ্চ গতিসম্পন্ন ট্রেনের টিকেট দেওয়া হয়নি। প্রায় ৭১ হাজার ঋণ খেলাপিকে তাদের করপোরেট চাকরি বা নির্বাহী পদ থেকে অপাসারণ করা হয়েছে। চীনের একটি বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে খেলাপি ঋণ গ্রহিতাদের কাছ থেকে পাওয়া ৫ লাখ ৫০ হাজার ঋণ ও ক্রেডিট কার্ডের আবেদন ফিরিয়ে দিয়েছে। দেশটির আদালত আমলা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিদেরকেও কালো তালিকাভুক্ত করেছে। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের পুরো নাম ও আইডি কার্ড নম্বর তুলে দেওয়া হয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে, যাতে যে কেউ ওইসব খেলাপিদের সম্পর্কে জানতে পারে।

অবশ্য বাংলাদেশেও একবার শীর্ষ খেলাপিদের নামের তালিকা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন লুৎফর রহমান সরকার। তবে ওই তালিকা প্রকাশের পর দেশের বহুল আলোচিত শীর্ষ এক ব্যবসায়ী এবং তার ভাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের কক্ষে গিয়ে তাকে রীতিমত শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে আর এ ধরনের তালিকা প্রকাশের ঘটনা ঘটেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, 'সরকার বাংলাদেশ ব্যাংককে একেবারে নির্জীব করে রেখেছে। যে কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকও অনেক কিছু পারছে না। সরকার যদি চায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব।'

গত দশ বছরে ব্যাংক খাত থেকে কি পরিমাণ অর্থ খোয়া গেছে তা নিয়ে সঠিক গবেষণা করতে পারবে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়ে তারা এ ধরনের উদ্যোগ নেবে না বলেই মনে করছেন ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা।

খাশোগি হত্যা : রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ

সিরাজুল ইসলাম

সৌদি আরবের ভিন্ন মতাবলম্বী সাংবাদিক জামাল খাশোগি খুনের ঘটনায় যে প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো- কেন তাকে হত্যা করা হলো? কী এমন ঘটেছিল যে, আমেরিকায় নির্বাসনে চলে গেলেও সৌদি আরব খাশোগিকে হত্যা করল? এর পাশাপাশি আরো যে কথাটি খুব জোরেশোরে ভাবনায় আসছে তা হলো- খাশোগিকে হত্যার ফলে কার কী লাভ বা ক্ষতি হলো?

জামাল খাশোগি খুন হওয়ার পর সারা বিশ্বে যেভাবে তোলপাড় হয়েছে এবং হচ্ছে তা অনেকটা নজিরবিহীন। অনেকে বলছেন, কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী নিহত হলেও সম্ভবত এতটা আলোচনা-সমালোচনা হতো না। এ আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে তেলসমৃদ্ধ এবং মুসলিম জাহানের কথিত নেতা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে। মার্কিন তৎপরতার কারণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারও এখন সে আলোচনা-সমালোচনার সমান ভাগীদার।

খাশোগি খুনের ঘটনায় এখন মুসলিম বিশ্বের কথিত নেতা সৌদি আরব যেমন আসামির কাঠগড়ায়; তেমনি সমানভাবে অপরাধী হিসেবে দেখা হচ্ছে আমেরিকাকে। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার সর্বশেষ বিবৃতিতে বলেছেন, যদি এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সৌদি যুবরাজ বিন সালমানের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে তাহলেও সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে তিনি তার 'অনৈতিক' অস্ত্র ব্যবসাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন; মানবতা কিংবা মানবাধিকার ট্রাম্পের কাছে বড় বিষয় নয়। এই অবস্থানের কারণে সৌদি আরবের সঙ্গে আমেরিকাকেও আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। যদিও সম্ভবত এতে ট্রাম্পের কিছু আসে যায় না। অস্ত্র ব্যবসা ঠিক থাকলে ট্রাম্পের সব ঠিক।

নিহত সাংবাদিক খাশোগি *যুবরাজ সালমান*

খাশোগি খুনের পর গত দুই মাসের কিছু বেশি সময়ে যেসব আলোচনা ও খবরাখবর পাওয়া গেছে তাতে একথা খুবই পরিষ্কার যে, আরব বিশ্বের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাজতন্ত্রের অবসান চেয়েছিলেন জামাল খাশোগি। তিনি ঝুঁকি নিয়ে সত্য লিখেছেন এবং সত্য তুলে ধরার কারণেই তাকে জীবন দিতে হয়েছে। এই চাওয়াগুলো বাস্তবে রূপদানের জন্য তিনি ছিলেন অনেক বেশি তৎপর। সে কারণে সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানের সমালোচনার বিষয়টি অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এও ঠিক যে, সৌদি আরবে বসবাস করে যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানের সমালোচনা করা সম্ভব নয়; তিনি বা রাজপরিবার তা সহ্য করবে না। ফলে জামাল খাশোগিকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে, পরিবার ছাড়তে হয়েছে, দেশ ছাড়তে হয়েছে। সৌদি আরব থেকে তিনি স্বেচ্ছা-নির্বাসনে সুদূর আমেরিকা চলে গেছেন। সেখানে গিয়ে লিখেছেন মন খুলে নিজের দেশের কথা, মানুষের কথা, গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার কথা। তার এসব লেখার এতটাই প্রভাব ছিল যে, সৌদি শাসকগোষ্ঠী বিশেষ করে বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ ও তার ছেলে যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান বড় ধরনের বিপাকে পড়েন। তাদের ক্ষমতা ও শাসনের ভীত কাঁপিয়ে দিচ্ছিলেন জামাল খাশোগি। তার লেখা ওয়াশিংটন পোস্টে যেমন ইংরেজি ভাষায় ছাপা হতো তেমনি তার গুরুত্বপূর্ণ সব লেখা আরবি ভাষায় অনুবাদ করে অনেকে ছাপতেন। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেমন সৌদি আরবের দুঃশাসন ও অব্যবস্থাপনার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ত তেমনি খোদ সৌদি আরবের লোকজনও তা জানতে পারতেন। খাশোগি বলতেন, আরব বিশ্বের মধ্যে শুধুমাত্র তিউনিশিয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে। এ স্বাধীনতা জর্দান, মরক্কো ও কুয়েতে আংশিক আছে। বাকি আরব বিশ্বের কোথাও স্বাধীনতা নেই। জামাল খাশোগি সৌদি যুবরাজকে গণতন্ত্রের বন্ধু নয় বরং প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ৩৩ বছরের যুবরাজ আজীবনের জন্য সাংবাদিক জামাল খাশোগির মুখ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নেন এবং পরিণতিতে জামাল খাশোগি এখন শুধুই অতীত!

জামাল খাশোগি আরব বসন্তকে দেখেছিলেন আরব বিশ্বের জন্য বিশাল সুযোগ হিসেবে। তিনি আশা করেছিলেন- আরব বসন্তের মাধ্যমে আরব বিশ্বে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পতন হবে এবং সুশাসন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুডের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে কাতারের আল-জাজিরা টেলিভিশনের ভূমিকা তিনি অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখতেন। আরব বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামভিত্তিক সংগঠনকে তিনি কাজে-কর্মে সমর্থন করতেন *(বাকি অংশ পড়তে মূল ওয়েব পোর্টাল www. the report 24.com ভিজিট করুন।)*

এবং পরিষ্কারভাবে মনে করতেন যে, এসব সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেয়ার অর্থ গণতন্ত্রের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া। সৌদি আরবের বিদ্যমান উগ্রবাদী ওয়াহাবি চেতনারও তিনি প্রচণ্ড সমালোচক ছিলেন। ইয়েমেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। সৌদি আরবে যে কথিত সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন যুবরাজ তারও তিনি সমালোচক ছিলেন। সৌদি রাজপরিবারের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। জামাল খাশোগি সবসময় বলতেন সৌদি আরবের সাধারণ লোকজন দারিদ্র, দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা ও অব্যবস্থাপনার শিকার। অন্যদিকে যুবরাজ নিজেকে সৌদি আরবের সমস্ত ভালোমন্দের একমাত্র কর্ণধার মনে করেন; এসব বিষয়ে কারো কোনো কথা বলার অধিকার নেই। ফলে খাশোগির সব কথাকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছেন এবং চরম প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। মূলত খাশোগিকে জীবন দিয়ে যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানের সমালোচনার মূল্য দিতে হয়েছে।

মিশরে আজ যে স্বৈরশাসক জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ক্ষমতায় তিনি মূলত আমেরিকা ও সৌদি আরবের সমর্থনে মসনদে বসেছেন। তার ক্ষমতায় আসার পেছনে যে ঘটনা প্রবাহ রয়েছে তা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি রক্তাক্ত। তিনি মিশরের জনমানুষের আকাঙ্খাকে পায়ে দলে, মুসলিম ব্রাদারহুডকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং এ সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে হত্যা ও কারারুদ্ধ করে আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। রাবেয়া স্কয়ারে তিনি সেনাবাহিনী দিয়ে শত শত লোককে হত্যা করেছেন। সেই সিসিকে সব রকমের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। সিসিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সৌদি সরকার মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের কবর দেয়ার ব্যবস্থা করেছে; পাশাপাশি আরব বসন্তের মাধ্যমে যে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রবিরোধী ঢেউ শুরু হয়েছিল তা চিরতরে স্তব্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছে। আমেরিকা এ কাজে সৌদি আরব ও সিসিকে সমানভাবে সমর্থন দিয়েছে। অন্যদিকে কাতার ও তুরস্ক মুসলিম ব্রাদারহুডের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। কাতারের আল-জাজিরা আরব বসন্তের পক্ষে কাজ করেছে জোরালোভাবে। আরব বসন্তের মাধ্যমে আরব জাহানে যে কাঙ্খিত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তার পক্ষে যেমন অবস্থান নিয়েছিল তুরস্ক ও কাতার তেমনি সৌদি আরবের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতে। শত শত কোটি ডলার খরচ করে মিশরের শাসনব্যবস্থা আবারো স্বৈরতান্ত্রিকতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে সৌদি আরব। আরব বিশ্বে আজ যেসব বড় বড় নেতিবাচক পরিবর্তনগুলো দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে সৌদি আরব সরাসারি জড়িত। তেমনি মুসলিম ব্রাদারহুড ইস্যুতে তুরস্ক ও কাতার একাট্টা। প্রথম দিকে সিরিয়া ইস্যুতে মার্কিন ও পশ্চিমা চাপের মুখে সৌদি আরবের সঙ্গে তুরস্ক ও কাতার মিলেমিশে বাশার আল-আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করলেও এক পর্যায়ে এ দুই দেশের সরকারও অনেকটা অনিরাপদ হয়ে পড়ে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে তুরস্কে সেনা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালানো হয় কিন্তু যেকোনোভাবে হোক সে প্রচেষ্টা প্রতিহত করেন প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান। তুরস্ক ও কাতারকে বন্ধুত্বের আড়ালে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেয় আমেরিকা। ২০১৭ সালের মে মাসে সৌদি আরবে নতুন ক্ষমতায় আসা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিয়াদে আরব-আমেরিকান সম্মেলন করেন এবং সৌদি আরবকে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেন। সৌদি আরবের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেন এবং এ কাজে প্রধান সহযোগী করা হয় জেনারেল সিসির মিশরকে। তুরস্ক ও কাতার তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাতারের ওপর অবরোধ আরোপ করে সৌদি আরব, মিশর বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। পেছন থেকে কলকাঠি নাড়তে থাকে আমেরিকা। কিন্তু তুরস্ক ও ইরান পাশে দাঁড়ানোর ফলে কাতার ভালোভাবেই টিকে যায়।

মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বের নানা ঘটনাবলীতে যখন তুরস্ক ও কাতারের এমন অবস্থান তখন সেই দুটি দেশের পক্ষে গেছে খাশোগির লেখা। ফলে তুরস্কের সঙ্গে খাশোগির যেমন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তেমনি দিন দিন সম্পর্কের অবনতি হয় সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে বিশেষ করে যুবরাজ ও বাদশাহর সঙ্গে। খাশোগির সঙ্গে তুর্কি ঘনিষ্ঠতার কারণে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে সৌদি কন্স্যুলেট ভবনে ফাঁদে ফেলে তার জীবন কেড়ে নেয়ার পরিকল্পনা নেয় রিয়াদ।

যুবরাজ বিন সালমানই ইয়েমেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন এবং হাজার হাজার মানুষ এতে নিহত হচ্ছে। দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে দেশটির শিশুরা অঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। যুবরাজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তেই কাতারের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করে দেশটির জনগণকে না খাইয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল সৌদি আরব। তার এই কঠোর মনোভাবের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব বহু আগেই যুবরাজ বিন সালমানকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে, তার সমালোচনা করতে গিয়ে জীবন দিলেন জামাল খাশোগি।

লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশ:

খাশোগি হত্যার পর প্রথমেই এবং সরাসরি যারা লাভবান হয়েছে তারা হচ্ছে সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠী। কারণ সামনে থেকে তারা শত্রুকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এটা খুব পরিষ্কার যে, খাশোগির লেখার প্রভাব অনেক বেশি ছিল বলেই তাকে অনেক বড় শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেছে সৌদি শাসকগোষ্ঠী এবং নির্মমভাবে তাকে হত্যা করেছে তারা। অবশ্য এ কাজে সৌদি আরবের সামনে অনেক বড় ঝুঁকিও ছিল। কারণ খুনের ঘটনাটি ঘটেছে তুরস্কের মাটিতে যা বেশ কঠিন কাজ। তারপরেও সেই কঠিন কাজ তারা করেছে। এটাও ঠিক যে, সাংবাদিক খাশোগিকে খুন করার ঘটনায় সৌদি আরব বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সারা বিশ্বে তাদের ভাবমর্যাদা লুণ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সৌদি শাসকগোষ্ঠী এখন নিতান্তই ঘৃণার পাত্র যা কোনো অর্থমূল্য বা বস্তুগত কোনোকিছু দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না। সৌদি বাদশাহ ও যুবরাজ পবিত্র মক্কা-মদীনার খাদেম বলে নিজেদেরকে দাবি করলেও তারা এখন শুধুই নির্মমতার মূর্ত প্রতীক। ইয়েমেনে বর্বরতার পর সারা বিশ্বে তারা আগ্রাসী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। খাশোগিকে খুন করার পর তাদের বর্বরতার চরমমাত্রা মানুষের কাছে আরো বেশি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পরই যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান যে উগ্রতা দেখিয়েছিলেন তার একটা নমুনা হলো ২০১৫ সালের মিনা ট্র্যাজেডি। সেখানে ইরানসহ বহু দেশের হাজিদেরকে প্রাণ দিতে হয় শুধুমাত্র বিন সালমানের বিতর্কিত কিছু সিদ্ধান্তের কারণে। এছাড়া,

মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডকে উৎখাত, ইয়েমেনে সামরিক আগ্রাসন এবং ইরাকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ -এসবই হয়েছে যুবরাজের প্রত্যক্ষ মদদে। কিন্তু সেসব ভেতরের খবর অতটা জানা যায়নি যতটা জানা গেল খাশোগি হত্যার ঘটনা থেকে। ফলে যুবরাজের অবস্থানই এখন সংকটের মুখে। শোনা যাচ্ছে তার কাছ থেকে দায়িত্ব ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে। যদিও তার বাবা বাদশাহ সালমান এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে একচেটিয়া সমর্থন দিচ্ছেন কিন্তু কতদিন এ সমর্থন অব্যাহত থাকবে এবং তিনি টিকে থাকতে পারবেন সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কারণ খোদ রাজপরিবারের মধ্যেই গোলযোগ রয়েছে, রয়েছে চাপা বিদ্রোহ। বহুসংখ্যক প্রিন্স ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে মুহাম্মাদ বিন সালমানের নির্দেশে আটক করে জেলের ভাত খাওয়ানো হয়েছে, অনেকে দেশছাড়া হয়েছেন। এসব ঘটনা যেকোনো সময় যুবরাজের জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। খাশোগি হত্যার ঘটনায় যুবরাজের ভাবমর্যাদা এতটাই ঠুনকো হয়ে গেছে যে, যদি নিজের অবস্থান ধরে রাখার কোনো চ্যালেঞ্জ আসে তাহলে তা মোকাবেলায় আগের মতো অন্তত পশ্চিমা বিশ্ব থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন পাবেন না তিনি। শুধু তাই নয়, খাশোগি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জার্মানি, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নরওয়ে সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি স্থগিত করেছে। পাশাপাশি পশ্চিমা অনেক দেশ এখন ইয়েমেনে আগ্রাসন বন্ধের দাবি জানাচ্ছে। খাশোগি হত্যার আগে কিন্তু এসব দেশ ইয়েমেন ইস্যুতে একেবারেই চুপ ছিল। ইয়েমেনে হাজার হাজার মানুষ নিহত হলেও তা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য ছিল না কিন্তু এক খাশোগির হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হাজারো ইয়েমেনি হত্যার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

আমেরিকা:

খাশোগি হত্যাকাণ্ডে আমেরিকার লাভ-ক্ষতির হিসাবও গুরুত্বপূর্ণ। সৌদি আরবের পাশাপাশি মার্কিন প্রশাসনের ভাবমর্যাদাও ক্ষুন্ন হয়েছে অনেক, যদিও গায়ের জোরে তা পাত্তা দিচ্ছে না ট্রাম্প প্রশাসন। তবে একথা ঠিক- সবকিছু তো গায়ের জোরে চলে না। খাশোগি হত্যার ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একেকবার একেক কথা বলেছেন। তিনি একবার বলেছেন, খাশোগি হত্যার ঘটনা প্রমাণিত হলে সৌদি আরবকে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে। আবার বলেছেন, যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান যদি এই হত্যার কথা আগে জেনে থাকেন তাহলেও আমেরিকা সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখবে। মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সরাসরি বলেছে, খাশোগি হত্যার বিষয়ে যুবরাজ বিন সালমান নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরও ট্রাম্প নিজের অবস্থানে ঠিক থাকতে পারেননি, তিনি ডিগবাজি দিয়ে সৌদি আরবের পক্ষ নিয়েছেন। এর মাধ্যমে যেমন তার ব্যক্তি ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ইমেজ। এমনিতেই সারা বিশ্বে বিতর্কিত কাজের জন্য আমেরিকার ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ; তারপর একটা হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার পর কীভাবে ট্রাম্প সেই দোষী ব্যক্তির পক্ষ নিচ্ছেন সে প্রশ্ন এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

এসব ক্ষতির পরও আমেরিকার জন্য বৈষয়িক কিছু লাভের সম্ভাবনা বয়ে এনেছে খাশোগি হত্যাকাণ্ড। যেমন ইরানের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে গেলে অনেক বেশি তেল উত্তোলন করা দরকার। কিন্তু সৌদি আরব সে কাজে রাজি ছিল না। এ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে কিছুটা টানাপোড়েনও সৃষ্টি হয়েছিল এবং সৌদি আরব আমেরিকাকে বেশ কিছু হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু খাশোগি হত্যার পর সৌদি আরব বিপদে পড়ায় সুযোগ নিচ্ছে আমেরিকা। এখন আমেরিকাই সৌদির পাশে থাকছে আবার তার ওপর চাপও সৃষ্টি করে তেলের উত্তোলন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তেলের বাজার কিছুটা স্থির হয়েছে যা আমেরিকার জন্য স্বস্তির কারণ। পাশাপাশি ইউরোপের কিছু দেশ সৌদির কাছে অস্ত্র বিক্রি স্থগিত করেছে এবং তারা যদি আর অস্ত্র বিক্রি না করে তাহলে পুরো বাজার আমেরিকার দখলে চলে যাবে যা ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য প্রশান্তির বিষয়। কারণ মার্কিন প্রশাসন যত বেশি অর্থের যোগান দিতে পারবে আমেরিকার জনগণের কাছে তারা তত বেশি প্রিয় হয়ে উঠবে; নৈতিকতার মূল্য সম্ভবত সেখানে খুব কম।

খাশোগি হত্যার ঘটনা সৌদি আরবকে অনেকটাই বন্ধুহীন ও দুর্বল করে ফেলেছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল সৌদি আরবের কাছ থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে নানা রকম সুযোগ নেবে। ইসরাইলের সঙ্গে এখন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে সৌদি আরব এক রকমের বাধ্য হয়ে গেছে। বিনা প্রশ্নে ইসরাইলের কথায় রিয়াদকে কাজ করতে হবে। ইসরাইলের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ হবে মুসলিম বিশ্বে সৌদি আরব তত একঘরে হয়ে পড়বে।

কিছুদিন আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, আমেরিকা সমর্থন না দিলে সৌদি সরকার এক সপ্তাহও ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। এতবড় অপমানের পরও সৌদি আরব এখন আমেরিকার কোনো কথার বাইরে যাওয়ার অবস্থায় নেই। ফলে হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ব্যবসা যেমন নিশ্চিত থাকছে তেমনি সৌদি আরব আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুগত হতে বাধ্য হবে।

তুরস্ক:

খাশোগি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তুরস্কের নাম একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। তুরস্ক যদি এ ঘটনা নিয়ে এত বেশি তৎপর না হতো তাহলে খাশোগি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আজকের এ পর্যায়ে আসতো কিনা সন্দেহ। তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোগান থেকে শুরু করে তুর্কি সরকারের প্রায় সব কর্মকর্তা ও দেশটির গণমাধ্যম এক কাতারে ছিল। ফলে সারা বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। সৌদি আরব খাশোগির নিখোঁজ ও নিহতের ঘটনা বেমালুম চেপে যেতে চাইলেও তুরস্কের তৎপরতার কারণে তারা আস্তে আস্তে সব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সিরিয়া ইস্যুতে এরদোগানের প্রথম দিকে বিতর্কিত ভূমিকা থাকলেও তিনি এখন সৌদি ও মার্কিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর; এরদোগানই এখন ন্যায়ের পক্ষের বড় কাণ্ডারি। মুসলিম বিশ্ব থেকে শুরু করে সারা বিশ্বে তার আলাদা অবস্থান তৈরি হয়েছে। নিজের দেশে বহু সাংবাদিককে জেলে ঢোকালেও সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যার ঘটনায় এরদোগান এখন সাংবাদিকদের বন্ধু।

জামাল খাশোগির হত্যার ঘটনাকে পুঁজি করে এরদোগান এখন আমেরিকার সঙ্গে ফতেহউল্লাহ গুলেনকে দেশে ফেরত আনার বিষয়ে দরকষাকষি করতেই পারেন। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরও তিনি ইরান থেকে তেল কেনার কথা জোর দিয়ে বলতেই পারেন। সিরিয়ার কুর্দি

ইস্যুতেও তিনি শক্ত অবস্থানে থেকে আমেরিকার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। সামগ্রিক বিচারে খাশোগি হত্যার ঘটনা তুরস্ককে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বেশ কিছু সুবিধা দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাতার:

সৌদি আরবের সঙ্গে কাতারের এখন অনেকটাই দা-কুমড়ার সম্পর্ক। দেশটির ওপর মারাত্মক অবরোধ দিয়ে রেখেছে সৌদি আরব ও তার আঞ্চলিক মিত্ররা। আকাশ, সমুদ্র ও স্থলপথে অবরোধ দিয়ে কাতারের জনগণকে দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলতে চেয়েছিল সৌদি আরব। কারণ কাতারের খাদ্য চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ সৌদি আরব থেকে কিংবা সৌদি ভূখণ্ড হয়ে দেশটিতে প্রবেশ করত। কাতারকে একেবারে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ করে ফেলার জন্য কাতার সীমান্তে সৌদি আরব খাল কাটার মতো কর্মসূচিও নিয়েছে। সৌদি আরবের এসব নির্মমতা আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের আড়ালে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু খাশোগি হত্যার ঘটনায় সৌদি নির্মমতা প্রকাশ্যে চলে আসছে। ফলে কাতারের প্রতি আন্তর্জাতিক সহানভূতি বাড়বে সেকথা জোর দিয়েই বলা যায়। এ ক্ষেত্রে কাতার কূটনৈতিক সুবিধা পাবে।

ইরান:

খাশোগি হত্যাকাণ্ড এবং এ সম্পর্কিত রাজনীতির সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক অনেকটা দূরবর্তী। কিন্তু সে দূরত্ব খানিকটা ঘুচিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সম্প্রতি তিনি খাশোগি হত্যার ঘটনা নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে অনেকটা ধান ভানতে শিবের গীতের মতো করে বলেছেন, "ইরান হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র"। জবাবে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মাদ জাওয়াদ জারিফ বলেছেন, "আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানলের জন্য ট্রাম্প হয়ত ইরানকে দায়ী করবেন এই কারণে যে, ইরান সেখানকার জঙ্গল পরিষ্কারে সাহায্য করেনি!"

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী করে রেখেছে সৌদি আরব। এছাড়া, ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য আমেরিকা সৌদি নেতৃত্বাধীন পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোকে দিয়ে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ বা জিসিসি গঠন করেছিল। কিন্তু কাতারের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে সেই জিসিসি এখন কার্যত অচল। এ সংস্থাটি এক প্ল্যাটফরমে ফিরে আসতে পারবে এমন সম্ভবনা খুবই কম। সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যার ঘটনায় কাতারের আল-জাজিরা টেলিভিশন তথ্য পরিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ও সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। এতে কাতারের সঙ্গে সৌদি আরবের শত্রুতা বেড়েছে। ফলে ইরানের জন্য একসময় জিসিসি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও সংস্থাটি এখন তার অস্তিত্ব বাঁচাতেই ব্যস্ত। পাশাপাশি কাতার ও মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড ইস্যুতে সৌদি আরবের সঙ্গে তুরস্কের একটা দ্বন্দ্ব ছিল। এ জায়গা থেকে তুরস্কের সঙ্গে সৌদির দ্বন্দ্বের কারণে ইরান-তুরস্ক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে। এছাড়া সুন্নি জগতে সৌদি আরবের নেতৃত্ব প্রশ্নের মুখে ফেলাও এখন ইরানের জন্য সহজ হয়ে গেল। এক্ষেত্রে বিকল্প নেতৃত্ব দরকার ছিল। তুরস্ককে ইরান সেই বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে সামনে রেখে পথচলা সহজ করতে পারবে।

লেখক : সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক

তরুণ ভোটার টানতে সোস্যাল মিডিয়ায় ঝুঁকেছে আ'লীগ

নুরুজ্জামান তানিম

আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চিরাচরিত ব্যানার-ফেস্টুন-লিফলেটের পাশাপাশি ভোটের প্রচারে ভার্চুয়াল জগতে মনোযোগ দিয়েছে আওয়ামী লীগ। দেশে মোট ভোটারের এক-তৃতীয়াংশই তরুণ। তাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বিশাল সংখ্যক এই ভোটার নির্বাচনের ফলাফল সহজেই পাল্টে দিতে পারে। তাই এই সমীকরণকে সামনে রেখে সংসদ নির্বাচনে দলটির বিশেষ নজর তরুণদের দিকে। এ জন্য প্রার্থী মনোনয়ন থেকে শুরু করে ক্যাম্পেইন পদ্ধতিতেই পরিবর্তন আনা হয়েছে। একইসঙ্গে ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমকে (সোশ্যাল মিডিয়া) নির্বাচনী প্রচারণার আওতায় আনা হয়েছে।

এসব বিষয় মাথায় রেখেই দলের নির্বাচনী কৌশল ঢেলে সাজিয়েছে আওয়ামী লীগ। তৈরি হয়ে গেছে নির্বাচনী ইশতেহার। দলের প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দেবেন শেখ হাসিনা। মূলধারা গণমাধ্যমের পাশাপাশি অনলাইন আর সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করা হবে।

এ জন্য আওয়ামী লীগের প্রচার উপ-কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে দলটির গবেষণা উইং-সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)।

গবেষণা উইং সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে প্রচারণার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তরুণ সমাজের যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বিগত বছরগুলোতে সে সম্পর্কে কিছুটা চিড় ধরেছে। তরুণদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের দূরত্ব কমানোই হবে এবারের নির্বাচনী প্রচারণার মূল লক্ষ্য।

আরও জানা গেছে, তরুণদের আকৃষ্ট করতে এবারের প্রচারণায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তো থাকবেই সঙ্গে তরুণদের ভবিষ্যৎ চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলনও মিলবে নির্বাচনী প্রচারণায়। টেলিভিশন মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন ইভেন্ট পরিচালনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে জোর প্রচারণা শুরু হয়েছে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে। কারণ দেশের অধিকাংশ তরুণই এই মাধ্যমে বেশি আকৃষ্ট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা বেশি সময় ব্যয় করেন। এ কারণে সামাজিক মাধ্যমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর দেশের তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সরাসরি প্রচারণার কাজটি তত্ত্বাবধান করবেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর জন্য বিভিন্ন কনটেন্ট সিআরআইয়ের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হবে। ইতোমধ্যে সেটি শুরু করেছে দলটির এ গবেষণা উইং।

চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দেশে মোট ভোটার সংখ্যা ১০ কোটি ৪১ লাখ ৪২ হাজার ৩৮১। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার পাঁচ কোটি ২৫ লাখ ১২ হাজার ১০৫ আর নারী ভোটার পাঁচ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ২৭৬ জন।

২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ভোটার ছিলেন নয় কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৬৭ জন। ২০০৮ সালে ছিলেন আট কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার। অর্থাৎ গত ১০ বছরে তরুণ ভোটার বেড়েছে দুই কোটি ২৫ লাখ। আগামী নির্বাচনে এরাই জয়-পরাজয়ে মুখ্য ভূমিকা রাখবেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে গত ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-পরিষদের এক বৈঠকে টেলিভিশন মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন ইভেন্ট পরিচালনার মাধ্যমে জোর প্রচারণা চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কমিটির সদস্যসচিব ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাছান মাহমুদ জানান, 'কোনো পত্রিকা বা টেলিভিশনে কোনো কিছু প্রকাশ করা ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে লাখ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই এই পরিবর্তনটি ঘটেছে। দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে বিধায় এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। আমরা সেই মাধ্যমকে আগামী নির্বাচনে কাজে লাগাতে চাই। সে লক্ষ্য আমরা একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছি। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করবে।'

এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রী মো. মুজিবুল হক দ্য রিপোর্টকে জানান, আমার নির্বাচনী এলাকা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ডিজিটাল মার্কেটিং এ প্রচারণায় নেমেছি। স্যোসাল মিডিয়া ফেসবুক ইউটিউব ব্যবহার করে নির্বাচনী এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছাবো। ব্যানার ফেস্টুন মাইকিংতো মিছিল মিটিংতো থাকবেই।

এদিকে ঢাকা-১৬ আসনের বর্তামান সংসদ সদস্য ইলিয়াস উদ্দিন

মোল্লাহ দ্য রিপোর্টকে জানান, এবার নির্বাচনের প্রচারণার জন্য ১১ মিনিটের একটি ভিডিও তৈরি করেছি। এটা ২ মিনিটে নামিয়ে আনবো। এক ক্লিকেই আমার নির্বাচনী এলাকা মিরপুর-পল্লবীর প্রায় ৯ লাখ ভোটারের ফেসবুকে পৌছে যাবে আমার এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভিডিও। এটা চলবে নির্বাচন পর্যন্ত। সেখানে সারাদেশে আওয়ামী লীগের উন্নয়ন কাজের বিবরণও থাকবে।

এদিকে আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম বিবিসি বাংলাকে একান্ত সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কৌশল, ইশতেহার, প্রচারাভিযান ইত্যাদি বিষয়ে বলেন, 'আমরা জানি, ইনকামবেন্সির একটা ব্যাপার আছে। একটা সরকার এক মেয়াদে ক্ষমতায় থাকলেই তার দ্বিতীয় মেয়াদে অসুবিধা হয়। আর আমরা তো চাইছি তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার সুযোগ। কাজেই আমাদের জন্য কাজটা বিরাট চ্যালেঞ্জিং। তারপর এবার তো সব দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। কাজেই এবার চ্যালেঞ্জটা অনেক বড়। সেই চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখেই দলের নির্বাচনী কৌশল ঢেলে সাজিয়েছে আওয়ামী লীগ। তৈরি হয়ে গেছে নির্বাচনী ইশতেহার। দলের প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দেবেন শেখ হাসিনা। আর মূলধারার গণমাধ্যমের পাশাপাশি অনলাইন আর সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করা হবে।'

কী থাকছে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে

আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করবে ১৮ ডিসেম্বর। এইচ টি ইমাম জানান, "ইশতেহার মোটামুটি ঠিক হয়েছে গেছে, এখন কেবল প্রকাশের অপেক্ষা। মূল ইশতেহার লেখা শেষ। আমাদের নেত্রী নিজে সম্পূর্ণটা দেখে দিয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন কমিটি এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন। যেমন নারীর ক্ষমতায়ন কিংবা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপ কাজ করেছে।"

কী আছে এই ইশতেহারে, তার কিছু ইঙ্গিত তিনি দিলেন। তিনি বলেন, "আমরা তো এর আগের নির্বাচনগুলোর ইশতেহারে বলেছিলাম রূপকল্প ২০২১ এর কথা। আর এবার আমরা বলছি ২০৪১ সালে আমরা বাংলাদেশকে এমন এক পর্যায়ে দেখতে চাই, যেখানে আমরা আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত, এবং অন্য সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছি। নতুন ভোটার এবং তরুণদের আকর্ষণের জন্য ইশতেহারে অনেক কর্মসূচি থাকবে। জোর দেয়া হবে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নেয়া বিশেষ মেগাপ্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে। ইশতেহারে গ্রাম-শহরের ব্যবধান কমিয়ে আনার ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। কৃষিতে জোর দেয়া হবে পুষ্টির ওপর।"

কীভাবে প্রচারণা চালানো হবে

এইচ টি ইমাম জানালেন, এই প্রথম কোন জাতীয় নির্বাচনী প্রচারণায় সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। আমরা অনেকভাবেই আমাদের প্রচার চালাবো। এখন তো প্রচার মাধ্যম অনেক বদলে গেছে। বাংলাদেশে এখন টেলিভিশন চ্যানেলই অজস্র। টেলিভিশন তো থাকবেই। তারপর আছে প্রিন্ট মিডিয়া। বাংলাদেশে সাড়ে আট কোটির মতো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা তাদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করবো। ফেসবুক, ইউটিউব এবং অন্যান্য যা অ্যাপস আছে, তার মাধ্যমেও ব্যাপক প্রচারণা চলছে। ভালো মন্দ উভয় দিকেই। আমরাও চেষ্টা করছি এগুলো ব্যবহার করার।"

বিশ্বের অন্যান্য দেশে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে যেভাবে নির্বাচনী প্রচার চালানো হয়, আওয়ামী লীগ এবার ব্যাপকভাবে তার ব্যবহার করবে বলে জানান তিনি।

এইচ টি ইমাম বলেন, "এটা তো আমরা ব্যাপকভাবে করবো। ক্যাম্পেইনের প্রচুর মেটেরিয়েল তৈরি হয়েগেছে। আমরা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে পয়সা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, যেভাবে করে, আমরা তাই করবো।"

তিনি আরও জানান, আওয়ামী লীগ তাদের প্রচারণায় দুটি বিষয়কে বেশি কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। একটি হচ্ছে দলের নেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এবং জনপ্রিয় তা। অন্যটি হচ্ছে গত এক দশকে বাংলাদেশের যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সেটি।

তবে বিগত নির্বাচনগুলোতে শেখ হাসিনাকে যেভাবে দেশজুড়ে জেলায় জেলায় গিয়ে নির্বাচনী জনসভা এবং পথসভায় অংশ নিতে দেখা গেছে, সেটি এবার হচ্ছে না, জানালেন মিস্টার ইমাম। কেবল নির্ধারিত কিছু কর্মসূচিতেই তিনি অংশ নেবেন।

এইচ টি ইমাম জানান, এবার এতো ব্যাপকভাবে তিনি জনসভা করবেন না। সম্ভব না। সময় অত্যন্ত কম। এই সময়ের মধ্যে উনি অতটা কভার করতে পারবেন না। যে সমস্ত জায়গায় যাওয়া খুব প্রয়োজন, উনি সেগুলোতে যাবেন। বাকীগুলো উনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারবেন। ২০০৮ সালেও এটা আমরা শুরু করেছিলাম। এভাবে উনি বিভিন্ন জায়গায় সংযুক্ত হয়ে বক্তৃতা দেবেন, মতবিনিময় করবেন।

কুড়ি বছর আগে পুত্রের কাছে পিতার চিঠি

প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের সংবাদপত্র

আবদুল আউয়াল মিন্টু

[লেখক পরিচিতি : ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তা হিসাবে আবদুল আউয়াল মিন্টু সুপরিচিত। দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন দুই মেয়াদে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা ইস্যুতে তার বিশ্লেষণ ও চিন্তা সুধী মহলে সমাদৃত। 'বাংলাদেশ: পরিবর্তনের রেখাচিত্র', 'Bangladesh: Anatomy of Change', 'সন্তানকে-পিতার কথামালা' ও 'শাক সবজির চাষাবাদ' নামে তার চারটি বই রয়েছে বাজারে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। ওই সময় তিনি পাকিস্তান শিপিং করপোরেশনের মালিকানাধীন একটি বাণিজ্যিক জাহাজের কর্মকর্তা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর বন্দরে অবস্থান করা ওই জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে দেশটিতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন এবং জনমত গঠন করেন।

২০১৩ সালে তিনি স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন (SOAS, University of London) থেকে কৃষি অর্থনীতিতে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের আওতাধীন মেরিটাইম কলেজ থেকে পরিবহন ব্যবস্থাপনায় (Transportation Management) মাস্টার্স ডিগ্রিও রয়েছে তার। একই প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবহন বিজ্ঞানে (Transportation Science) বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। চট্টগ্রামের জুলদিয়া মেরিন একাডেমি থেকে নৌবিদ্যায় ডিপ্লোমা করেন তিনি। ১৯৪৯ সালে ফেনী জেলার আলাইয়ারপুরে তার জন্ম।

শিপিং, রেস্টুরেন্ট, ব্যাংক, বীমা, জ্বালানি, সিমেন্ট, পর্যটন, শিল্প বিপণন, বীজ ও গবাদি পশুর উন্নয়নের মতো বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনি।

কৈফিয়ত : এটি পুত্রকে উদ্দেশ করে বাবার লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। চিঠিতে সংবাদপত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এ ধরনের চিঠি লিখতেন। তার পরতে পরতে থাকত সন্তানের প্রতি পথ-নির্দেশনা । প্রায় কুড়ি বছর আগে আবদুল আউয়াল মিন্টু সংবাদপত্র বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করে তার জ্যেষ্ঠপুত্র তাবিথ আউয়ালকে দুটি চিঠি দেন। দুটি চিঠির একটি পাঠকের জন্য নিবেদিত হলো। আবদুল আউয়াল মিন্টুর 'সন্তানকে পিতার কথামালা' পুস্তকে এ চিঠিটি স্থান পেয়েছে-সম্পাদক]

ঢাকা
১৩ মার্চ ১৯৯৮
তাবিথ

কেমন আছো? আমরা ভালো।

চারদিন হয় আম্মু ও তাজওয়ার ব্যাংককে আছে। তাজওয়ারকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। গতকাল তার মেডিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টগুলো পেলাম। আমার সাথে কথা বলার পর আম্মু তোমাকে ফোন করেছিল। ডাক্তার বলেছে তাজওয়ার যেন কোনো কিডনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়। সম্ভবত তার কিডনিতে সমস্যা আছে। গুরুতর বা বিপজ্জনক নয়। আম্মু সিঙ্গাপুরে আরেক ডাক্তারের পরামর্শ নিতে চায়। সে জন্য আমেরিকার পরিবর্তে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। তুমি মন খারাপ করো না।

তাজওয়ারের ব্যাপারে অবশ্য আমি একটু চিন্তিত। মোটামুটি প্রায় নিয়মিত তাকে ডাক্তার দেখানো হয়। কয়েক মাস আগে তাজওয়ারের একটা ছোট অপারেশন হয়েছিল। হঠাৎ করে আবার নতুন সমস্যার জন্য আমি ও আম্মু চিন্তিত। তবে আশা করি সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। যখনই আমি আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি তখনই তিন ছেলের ভালো স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুখী জীবন ছাড়া আর তেমন কিছু কামনা করি না।

আম্মু সিঙ্গাপুর গিয়ে পৌঁছাবে রাত ১০.৪৫ মিনিটে। তারা দুজনই আঙ্কেল বি সি টে (B C Tay)-এর বাসায় থাকবে। আংকেল বি সি টে সিঙ্গাপুরে চায়নিজ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রেসিডেন্ট। সেই সূত্র ধরে আগামী দু বছরের জন্য সিঙ্গাপুর পার্লামেন্টের সদস্যও বটে।

বিশ্বব্যাংক ক্যাফেটারিয়ায় তুশির মায়ের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছো; খুব ভালো ক্যাফেটারিয়া। তোমার পছন্দ হয়েছে? ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডিপার্টমেন্টের ডিনের সঙ্গে দেখা করেছো জেনে খুশি হলাম।

ইউনোকল (বাংলাদেশ)-এর স্থানীয় প্রতিনিধি মি.ডিক রোহেরিগ (Dick Roherig) ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা মি. চাক পিয়ারস (Chuck Pierce) শিগগিরই ওয়াশিংটন, ডিসিতে যাবেন। তারা তোমার বন্ধু ফাতেমার বাবাসহ অন্যান্য বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তার সাথে দেখা করবেন। ডিক সাহেব ওয়াশিংটন যাওয়ার আগে তোমাকে জানাবেন। যোগাযোগ করলে তাদের সাথে দেখা করো। তাকে ফাতেমার বাবা জনাব সাদাতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে ও তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করো। সাদাত সাহেবকে অনুরোধ

করবে যে, তিনি যেন ইউনোকল কোম্পানিকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে শুনে খারাপ লাগছে। তোমাকে আগেই লিখেছি, আমাদের বৃহত্তর পরিবারের সব সদস্যের ঠাণ্ডার ধাত আছে। অবশ্যই তুমি আমার আগে পাঠানো ই-মেইলটি মনোযোগ সহকারে পড়বে। সেখানে এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছি। বারংবার এ সমস্যা এড়াতে ই-মেইলের উপদেশ মেনে চলবে।

ডরমিটরি ছেড়ে অ্যাপার্টমেন্ট-এ থাকার ব্যাপারে আমার মত হলো- আপাতত ক্যাম্পাসের ডরমিটরিতে থাকা ভালো। আর যদি অ্যাপার্টমেন্টে থাকার বাসনা প্রবল হয় তাহলে তার কারণগুলো বিশদ জানাবে। জানানোর পর তোমাকে এ ব্যাপারে সুপরামর্শ দেবো। তবে অ্যাপার্টমেন্টটা ক্যাম্পাসের ভেতরে হতে হবে যাতে ক্লাসে হেঁটে যেতে পারো। আশপাশের এলাকা অবশ্য ভালো হতে হবে। হতে হবে নিরাপদ। তাছাড়া একা থাকবে না, অন্য কাউকে সাথে রাখবে। আনুষঙ্গিক খরচসহ সব মিলে মাসে কতো খরচ হবে; খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত কিভাবে করবে, সব জানাবে।

গাড়ি কেনার ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো বসন্তকালীন সেমিস্টার ১৯৯৯ সাল অর্থাৎ আগামী জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভালো হয়। আমি আগামী ১৫ তারিখে অর্থমন্ত্রীর সাথে 'নেপাল বাংলাদেশ যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বার্ষিক সভায় যোগদানের জন্য নেপাল যাবো। ওখানেই অর্থমন্ত্রী ও আমি নাবিল ব্যাংকের অভ্যর্থনা ও মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেবো। তার আগে আমরা দুজন মিলে নতুন নাবিল ব্যাংক হাউজ-এর উদ্বোধন করবো। মধ্যাহ্নভোজের পর নেপাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে প্রগতি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড প্রদেয় ব্যবস্থাপনা সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবো। নেপাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মূলত বিনোদ আঙ্কেলের।

২ অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখের চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম যে বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ ও সংবাদের গুণগত মান সম্পর্কে লিখবো। আজ সেটা নিয়েই লিখছি। সংবাদপত্র নিয়ে লেখার কারণ হচ্ছে ঢাকায় থাকাকালে আমাকে নিয়ে অনেক খবর তোমার নজরে এসেছে। বেশ কয়েকবার আমার কাছে জানতে চেয়েছো, খবরটা সত্যি কিনা? অনেক সময় তুমি নিজেই বলেছো এটাতো সত্যি নয়! আমিও তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলার সময় করতে পারিনি। গোটা এই চিঠিটা পড়লে অন্তত সংবাদ ও অভিমতের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নিতে পারবে।

সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে অবাধ, মুক্ত ও প্রাণবন্ত সংবাদপত্র শিল্পের অধিকারী বাংলাদেশ। এ আমাদের গৌরব। খবরের কাগজ ও সাংবাদিক সমাজ সাধারণত সমাজের চোখ, কান, মুখ ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। আমরা সবাই চাই এই মাধ্যমটি বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকুক। তবে এই শিল্পের একটি অনিবার্য আবশ্যকতা হচ্ছে, একে স্বনিয়ন্ত্রিত হতে হবে। সংবাদ ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম এই শিল্প মাধ্যমকে অবশ্যই

অনুসরণ করতে হবে।

বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের দেশে মুক্ত সাংবাদিকতার ইতিহাস প্রাচীন নয়। এ শিল্পে জড়িত সাংবাদিকদের প্রাপ্য বা প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নেই এবং সংবাদপত্রগুলোও কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতের অনুসারী অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত। সংবাদপত্রের হাতে কোনো বিষয়ে অকাট্য দলিল দ্বারা সমর্থিত তথ্য প্রমাণ থাকলে, ঐ বিষয়ে সত্য প্রকাশে তাকে অবশ্যই নির্ভীক হতে হবে, কিন্তু না থাকলে নিছক অনুমান ও কানকথার ওপর ভিত্তি করে কোনো কিছুই ছাপা বা প্রকাশ করার বিষয়ে সংবাদপত্র নিজেকে বিরত রাখবে।

সাংবাদিক, সম্পাদক ও খবরের কাগজ অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমালোচনা করবে; তবে সেই সমালোচনা অবশ্যই হতে হবে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার ফসল ও গঠনমূলক। এ সমালোচনায় কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা বৈরিতা থাকবে না। সৎ সাংবাদিকতা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক। সাংবাদিকতা আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাকে উদ্দীপ্ত ও দ্রুততর করতে পারে।

কিন্তু বিপদ হলুদ সাংবাদিকতা নিয়ে। এমনিতেও স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের সরবরাহ করা সংবাদ (fed news) নতুন কিছু নয়। কিন্তু হলুদ সাংবাদিকতা ও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সংবাদ, গুজবকে 'বিশ্বস্ত সূত্র' বা 'বিশেষজ্ঞের' মতামত ইত্যাদি বলে সংবাদ হিসেবে চালিয়ে দেয়া হলে তা ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকারসহ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সংবাদপত্র বা মুদ্রণ মাধ্যমকে বাইরের নয়, এমনকি নিজস্ব প্রণীত নীতিমালা ও বিধির আওতায় কোনোরকম স্বনিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার কথা বললেই বহু সাংবাদিক বন্ধু তৎক্ষণাৎ উচ্চঃস্বরে বলতে চান আমরা যদি সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি তাহলে মৌলিক স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ সংবাদপত্রের স্বাধীনতাই বিপন্ন হবে! সাংবাদিক বন্ধুরা বলতে বা মানুষকে বোঝাতে চান যে, খবরের কাগজে যে-কোনো খবর ছাপার বিষয়টি একটি পরম (absolute) অধিকার, যে অধিকারকে সর্বদাই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে; তাতে অন্য কোনো মূল্যবোধের সাথে যেমন ব্যক্তির একান্ত অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, ব্যক্তির পারিবারিক জীবন, ব্যক্তি মর্যাদা, সামাজিক সুনাম ক্ষুণ্ন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ব্যক্তির নিরাপত্তার অধিকার বা মানুষের যে কোনো মৌলিক অধিকারের সাথে ঐ সংবাদের সংঘাত হোক বা না হোক।

তারা সচরাচর যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, সংবাদের বৈধতা নির্ধারণ করা সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব নয়। তাদের দায়িত্ব হলো তারা যে তথ্য পান তা শুধু প্রকাশ করা। ধারণাটি হয়তো বেশ উঁচু আদর্শ ও মহৎ আবেগ প্রণোদিত, কিন্তু নিরেট বাস্তবতা হলো এই যে সংবাদপত্র শিল্পে এমন সব শক্তি, এমনকি কিছু অপরাধীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যারা ব্ল্যাকমেইল করবেই। এ সব লোক ঘটনার উপস্থাপনায় তারা তাদের অধিকারের অপব্যবহার করে। তথ্য পাওয়ার উৎস অথবা কে ঐ তথ্য সরবরাহ করেছে, তাদের চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, আচরণ, বিশ্বাস ও বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদিকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার উপায় নেই।

এ ধরনের সংবাদের যথার্থতা ও সত্যতা অনুসন্ধান করার আন্তরিক চেষ্টা সংবাদপত্র মহলে খুব কমই দেখা যায়। অনেক সময় এ অধিকারের অপব্যবহারের কুসংস্কারকেও ভালো কিছু হিসেবে দেখানো হয়, আবার অনেক সময় অনেক আধুনিক ধ্যানধারণাকে পর্যন্ত সাংবাদিকরা সরাসরি নাকচ করে দেন খারাপ অথবা কুসংস্কার হিসেবে। এটা নির্ভর করে সাংবাদিকদের কারা এ ধ্যানধারণা দিয়েছে তার ওপর।

এ ছাড়াও সংবাদপত্রগুলোকে সংবাদপত্রের মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্যাংক, বীমা, যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো সংবাদপত্রগুলোরও বৈশিষ্ট্য লোক-প্রতিষ্ঠানের মতো। আর সে কারণেই সংবাদপত্রকে সে ভাবেই বিচার করা উচিৎ।

কারও চরিত্রহনন, জনসাধারণকে ব্ল্যাকমেইল করা এবং জনসমালোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সংবাদপত্রকে সংবাদপত্রের মালিকের স্বার্থে ব্যবহার করা এবং কায়েমি স্বার্থবাদী মহলগুলোর সঙ্কীর্ণ অভিমত প্রচার করার কাজে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করতে দেওয়া অবশ্যই উচিৎ নয়।

দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, আজকাল বাংলাদেশের প্রায় সংবাদপত্রই প্রায়ই এমন সব সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করে যা শুধুমাত্র মালিক বা বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করে। সংবাদপত্র শিল্পকে অবশ্যই স্বনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাংবাদিকতা ও হলুদ সাংবাদিকতার, সংবাদ ও অভিমতের (News and Views), সাংবাদিকদের সংবাদ লেখার অধিকার ও ব্যক্তির অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ব্যক্তির অধিকারকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে। ব্যক্তি নাগরিকের অধিকার, মান-মর্যাদা, গোপনীয়তার অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করতেই সংবাদপত্র শিল্পে অবশ্যই স্ব-নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

এ ছাড়াও সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশে আরও কিছু অন্তরায় রয়েছে। জনগণের তথ্য জানার যে অধিকার; একই সঙ্গে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রশ্নে নিজের অবস্থান স্থির করার ব্যাপারে সংবাদপত্র মানুষকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু দেশে সংবাদপত্রের মূল্য, বিজ্ঞাপনের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী থাকা, বা কোনো ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা গোপন উৎস থেকে ক্রমাগত অর্থ সাহায্য পেয়ে পরিচালিত হতে থাকলে সত্যিকার অর্থে সংবাদপত্রের কোনো স্বাধীনতা থাকে না।

তাফসির আজকাল খুবই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছে। আম্মুর অবর্তমানে সে বিশেষভাবে তাজওয়ারের দেখাশোনা করছে। তাজওয়ারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে খুব চিন্তিত ও সচেতন। খুব পরিশ্রম করে লেখাপড়াও করছে। ফোনে সময় নষ্ট করে না। এ কোয়ার্টারে গ্রেড বেশ ভালো করবে বলে আশা করা যায়।

অন্য সব কিছু ঠিক আছে। তোমার অনুপস্থিতি আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি।

চিরকালের স্নেহ-ভালোবাসায় উদ্ভাসিত হোক, পরিপূর্ণ হোক তোমার জীবন। ভালো থেকো।

বাবা

শওকত আলীর অপ্রকাশিত দু'টি কবিতা

[ভূমিকা : শওকত আলী (জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ - ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮) একজন বাঙালি কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষক। তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে গল্প ও উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৯০ সালে সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে একুশে পদকে ভূষিত করে। ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৮টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
এই গুণী মানুষটি ভেতরে ভেতরে কবিতার সাথেও বসত করতেন। মৃত্যুর অবব্যহিত পরে সেই তথ্যটি জানা গেল তার পুত্র আসিফ শওকত কল্লোলের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই অবাক হওয়ার মত সত্য- গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক ও গদ্যকার শওকত আলীর অপ্রকাশিত কবিতা প্রাপ্তি। যা তার পুত্রের মারফতে আমাদের হস্তগত হয়েছে। এ কারণে তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। নিঃসন্দেহে পাঠকের জন্য এটা একটা বড় প্রাপ্তি ।-সম্পাদক]

শওকত আলী ও শওকত আরা

জন্মদিন

তোমার কথা পড়লে মনে
ভিড় জমিয়ে মন- আকাশে
দোঁহরে দেখা স্বপ্ন যতো
কোমল ছায়া ফেলতে থাকে

তোমার কথা পড়লে মনে
ব্যর্থ প্রাণের বেদনাভার
দিন যাপনের ক্লান্তি খাতা
দেয় মুছিয়ে সন্ধ্যা সমার
অনিন্দ্য মুখ উৎস থেকে
থির বিচ্ছুরি হাসির আভা
বিস্মিত হয় হৃদয় জুড়ে

তোমার কথা পড়লে মনে
কেউ কাঁদে না বক্ষোমাঝে
শিশুর মুখের ফুল্ল হাসি
এবং শুনি রক্তধারায়।
তোমার কথা পড়লে মনে
হিম ঝরানো আকাশ দেখি
ফুল ফোঁটানো বৃষ্টিপাতের
আওয়াজ শুনি চৈত্ররাতে।

তোমার কথা পড়লে মনে
ফুটবে জানি বিদায় কালে
ভালোবাসার গুচ্ছ কুসুম
যা দিতে চাই তরুণ প্রাণে।

বিদায় হে প্রেম

প্রেমকে এবার বিদায় দিলাম সহজেই
আর তো এখন নেইকো তেমন সর্বনাশ
বিদায় হে প্রেম জায়গা কোথায় রাখবো যে
বিদায় এবার হে যৌবন, বিদায় ভাই

তখন ছিলে চৌদি যেতে ভীষণ দিন
ভয়ের নীচে লুকিয়ে ছিলো জীবন দীপ
প্রেমই ছিলো তখন শুধু অনশ্বর
ভয়ের মুখে রক্ত কুসুম বিদ্রোহ
আশা তখন পালিয়ে ফেরে সশঙ্ক
বিশ্ব সেরা আত্মঘাতী শব্দহীন
শীর্ণশাখে ফুল ফোটানোর দারুণ কাজ
তোমার কাছেই শিখতে হতো অনন্তর
তোমার কাছেই হে প্রেম আমার কল্যাণী
প্রদীপ শিখা রাখতে শেখা অনির্বাণ
মরণ তখন যদিও ছিলো অন্তহীন
তোমার হাতেই ফুটতো শত জীবন ফুল ।
এখন দেখি ভয়ের ছায়া নিঃশেষ
মরণও আর খেলছে না তো উল্লাসে
এবার খুঁজি পাওনা লুটের কায়দাটা
পুরান কথা শুনবো কেন অনর্থক ।

হেলাল হাফিজের কবিতা

অস্ত্র সমর্পণ

মারণাস্ত্র মনে রেখো ভালোবাসা তোমার আমার।
নয় মাস বন্ধু বলে জেনেছি তোমাকে, কেবল তোমাকে।
বিরোধী নিধন শেষে কতোদিন অকারণে
তাঁবুর ভেতরে ঢুকে দেখেছি তোমাকে, বারবার কতোবার।

মনে আছে, আমার জ্বালার বুক
তোমার কঠিন বুকে লাগাতেই গর্জে উঠে তুমি
বিস্ফোরণে প্রকম্পিত করতে আকাশ, আমাদের ভালোবাসা
মুহূর্তেই লুফে নিতো অত্যাচারী শত্রুর নিঃশ্বাস।

মনে পড়ে, তোমার কঠিন নলে তন্দ্রাতুর কপালের
মধ্যভাগ রেখে, বুকে রেখে হাত
কেটে গেছে আমাদের জঙ্গলের কতো কালো রাত!
মনে আছে, মনে রেখো
আমাদের সেই সব প্রেম-ইতিহাস।

অথচ তোমাকে আজ সেই আমি কারাগারে
সমর্পণ করে, ফিরে যাচ্ছি ঘরে
মানুষকে ভালোবাসা ভালোবাসি বলে।

যদি কোনোদিন আসে আবার দুর্দিন,
যেদিন ফুরাবে প্রেম অথবা হবে না প্রেম মানুষে মানুষে
ভেঙে সেই কালো কারাগার
আবার প্রণয় হবে মারণাস্ত্র তোমার আমার।

অগ্ন্যুৎসব

ছিল তা এক অগ্ন্যুৎসব, সেদিন আমি
সবটুকু বুক রেখেছিলাম স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রে
জীবন বাজি ধরেছিলাম প্রেমের নামে
রক্ত ঋণে স্বদেশ হলো,
তোমার দিকে চোখ ছিলো না
জন্মভূমি সেদিন তোমার সতীন ছিলো।

আজকে আবার জীবন আমার ভিন্ন স্বপ্নে অংকুরিত অগ্ন্যুৎসবে
তোমাকে চায় শুধুই তোমায়।
রঙিন শাড়ির হলুদ পাড়ে ঋতুর প্লাবন নষ্ট করে
ভর দুপুরে শুধুই কেন হাত বেঁধেছো বুক ঢেকেছো
যুঁই চামেলী বেলীর মালায়,
আমার বুকে সেদিন যেমন আগুন ছিলো
ভিন্নভাবে জ্বলছে আজও,
তবু সবই ব্যর্থ হবে
তুমি কেবল যুঁই চামেলী বেলী ফুলেই মগ্ন হলে।

তার চেয়ে আজ এসো দু'জন জাহিদুরের গানের মতন
হৃদয় দিয়ে বোশেখ ডাকি, দু'জীবনেই বোশেখ আনি।
জানো হেলেন, আগুন দিয়ে হোলি খেলায় দারুণ আরাম
খেলবো দু'জন এই শপথে
এসো স্ব-কাল শুদ্ধ করি দুর্বিনীত যৌবনেরে।

যুদ্ধ

আশান উজ জামান

খুব কাতরাচ্ছে আব্বাস আলী। তার মাগো আর বাবাগোয় গমগম করছে চারপাশ।

একটু পরপরই বলছে 'ছেদু, ভাই আমার, বাচা আমারে। ভাইরে আমি মরে গেলাম। আমারে বাচা।'

অবাক লাগছে ছেদুর। গেল বিস্যুদবারেও অন্যরূপ দেখেছে ওদের। আব্বাস করিমদ্দি আর আজম আলি। লাফাচ্ছিল বেশি আব্বাসই। আর লাফাচ্ছিল তার হাতের মশাল। তিড়িং বিড়িং করে মশালটা এগিয়ে যাচ্ছিল এঘর থেকে সেঘর। তার আগুনচুমোয় জ্বলে উঠছিল প্রতিটা চাল। খড়ের। গোলপাতার। তালপাতার। সেই লকলকে আলোয় আব্বাসের ফর্সা মুখের উপর চিকচিক করছিল তৃপ্তির ঘাম। চোখদুটোয় ঝিলিক দিচ্ছিল পাশবিক শান্তি।

মনে আছে ছেদুর।

তার 'আল্লা হকবার আল্লা হকবার' কানে বাজছে এখনো।

মেয়েদের দায়িত্ব ছিল করিমদ্দি আর আজম আলীর উপর। ধরে বেঁধে তাদের জিপগাড়িতে তুলল তারা। সব ক'জনের আহাজারি শুনতে পাচ্ছে ছেদু। এখনো।

রামপুর স্কুলে ক্যাম্প হয়েছে। গ্রামে গ্রামে শান্তি কমিটি গজিয়ে উঠছে, এও জানা খবর। এগ্রাম সেগ্রাম মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে। লুটতরাজ চলছে। চুরি চামারি শেষে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে বাড়িগুলোয়। কিন্তু এতদূরের পথ পাড়ি দিয়ে এই অচ্ছুত অপবিত্র বাগদিপাড়ায় মিলিটারি আসবে এটা ভাবেনি কেউ। তবু, সাবধানের মার নেই। প্রথম যেদিন খবরটা শুনেছিল, পালিয়েছিল যে যেদিকে পারে। কিন্তু তারা আসেনি সেদিন, এসেছিল রাজাকারের বাচ্চারা। ফাঁকা ঘরবাড়ি ফাঁকা করে দিয়েছিল। সেদিন যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু নিয়েছিল আরেকদিন। সেদিনও 'মিলিটারি আসচে মিলিটারি আসচে' রব উঠেছিল। ছেদুরা পালিয়েছিল।

কিন্তু যেদিন সত্যিই আসলো যমদূতেরা, সেদিন কোনো আওয়াজ হয়নি। অপ্রস্তুত অবস্থায়ই ধরা পড়েছে পুরো পাড়া। আর জ্বলে উঠেছে নিরীহ শুকনো বাঁশপাতার মতো। কিংবা সোনালি ফেশো জড়ানো সাদা লিকলিকে পাটকাঠির মতো।

ঘরের পেছনে বাঁশবাগান। তার পেছনে মানকচুর ক্ষেত। ওই ক্ষেতে কাজ করছিল ছেদু।

তখন বিকেল। খুব চাপ ধরেছিল। গাঁট থেকে পাতার বিড়ির পাছাটা বের হয়ে এসেছিল হাতে। ধরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসেছিল বাগানে। দূর থেকে বাগানটাকে অভেদ্য মনে হয়। কাছে যেতে থাকলেই হালকা হতে থাকে গাছড়ার ভীড়। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ফলে আড়াল পাওয়া দায়। চোখবুজেই তাই আড়াল আনে পাড়ার লোকেরা। যে দেখে দেখুক, তাকে নিজে না দেখলেই হলো! ওখানে গিয়েই সেদিন বেঁচে গিয়েছিল ও। এবং আরও কয়েকজন, যারা পালাতে পেরেছিল। লুকিয়েছিল ওই বাগানে। কচুক্ষেতে। বা তারও পেছনের পাটবনে। তবে বাঁশবাগানে ছেদুর সাথে যারা ছিল, সবাই দেখেছে কী লীলা ওইদিন চালিয়েছে পাষণ্ডরা।

এলোপাতাড়ি যে লাশগুলো নকশা কেটেছিল বাগদিপাড়ার ছ্যাদলাপড়া কালচে মাটির বুকে, তার মধ্যে খেদিও ছিল। আধো বোলের বয়স পেরিয়েছে কেবল। মুখটা ভরে ওঠেনি দাঁতে। উঠোনে বসে মেয়েটার মাথায় তেল দিচ্ছিল খগেন। খেদির হালকা লাল যখন খগেনের ঘন কালচের সাথে মিলে যাচ্ছিল, দূর থেকেও ছেদু বুঝেছিল ও রক্ত মিশছে না একটায় আরেকটা। মেশার কথা না। জল যেমন জল চেনে, রক্তও তো তেমন। একের সাথে আর মেশে না। খেদির মার কথা মনে পড়ছিল। মরার আগে কাউকে বলে যায়নি সে, কেউ তাই জানে না কিছু।

ছেদুর বুকে তখন কেমন কেমন ভীষণ একটা যন্ত্রণা। যেন রসের হাঁড়ি থেকে টগবগে ফুটন্ত নলুনে গুড় নিয়ে কেউ ঢেলে দিয়েছে গলায়। কিংবা দেড়শ'টা বোলতা হুল ফুটিয়েছে একসাথে। কিংবা শিংমাছের ডেরায় হাত পড়েছিল, কাঁটা মেরেছে দলবেঁধে।

লাশগুলোর উপর দিয়ে এক্কাদোক্কা খেলার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে জিপে উঠেছিল আব্বাসরা। ওর সেদিনের কাণ্ডের সাথে আজকের এই গোঙানিটাকে মেলানো যাচ্ছে না। ঘর জ্বালাতে জ্বালাতে যে লোক মুখে ফেনা তুলে ফেলছিল আল্লা আল্লা করে, আজ সে একবারও আল্লাকে ডাকেনি। অন্তত শোনেনি ছেদু। একবারও শুয়োরমুখো মালাউন গুখেকো বা হিঁদুর বাচ্চা বলে গাল দেয়নি ওকে। বরং এমনভাবে ভাই ভাই করছে, আব্বাসের মা থাকলে স্বীকার করতে বাধ্য হতো, ছেদু তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে।

সাপে কেটেছে আব্বাস মিয়াকে। চিকিৎসা করাতে হবে। ঘণ্টাখানেক হয়েছে ছেদুকে ধরে এনেছে শান্তিকমিটির চেলারা।

ও চিকিৎসক না। ওঝাও না। তবে দারুণ একটা ক্ষমতা আছে ওর। এমন কোনো সাপ নেই যা ও ধরতে পারে না। সাপ ধরা আর পোষা ওর শখ। একার সংসার। দুবেলা দুমুঠো হলেই হয়। সপ্তায় দুসপ্তায় এক দুটো জোন দেয়। একটু আধটু মাছ টাছ ধরে। আর ওই সাপ বিক্রি। সব মিলে খারাপ চলে না।

ওর কাছে সাপ কিনতেন নাগরাজ ওঝা। এ অঞ্চলে বিখ্যাত। ওঁ-ই বলেছিলেন, সাপের ওপর এত দখল ছেদুর, ওঝাগিরিটা একটু শিখে নিলে সাতপুরুষের আর কষ্ট করা লাগবে না। তা হলে তো ভালোই হয়। ও তাই শিষ্যত্ব নিয়েছিল নাগরাজের। কিন্তু বছর দুয়েক পরেই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন গুরুজি ওকে।

শেখা তাই হলো না আর।

তবে মানুষের মুখ বড় আজব যন্ত্র, যা বের করে, তা-ই বিশ্বাস করে অন্যরা। *(বাকি অংশ পড়তে মূল ওয়েব পোর্টাল www. the report 24.com ভিজিট করুন।)*

চা'র দোকানে কে যেন একদিন বলল, সকল বিদ্যা ছেদুর জিম্মায় রেখে নাগরাজ গেছে কামরূপ কামাখ্যা, নতুন তন্ত্রের সন্ধানে। রাষ্ট্র হয়ে গেল কথাটা। তারপর থেকেই তার এই নামডাক। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তার হাতে একটা রোগীও মরেনি এখনো। সবই যে মা মনসার কৃপা তা ছেদু ছাড়া আর যে জানত তারও খোঁজ নেই। ফলে লোক তাকে সিদ্ধপুরুষ বলেই মানে।

প্রথম রোজার দিন আজ। ছেহরি খেয়ে নামাজ পড়েছে আব্বাস। নামাজ পড়েই ঘুমোনো অভ্যাস তার। ঘুমোতেই যাচ্ছিল। তার আগে গিয়েছিল গরম পানি ছাড়তে।

রান্নাঘরের পিছনে বাগান। বাগানে তখন ঝিরিঝিরি বাতাস। পাতায় পাতায় সতর্কতা। ফিসফিসানি। আর চাপা আতঙ্ক। তবু আলো হয়ে গেছে চারপাশ। কেউ দেখে ফেলে কি না, ভাবতে ভাবতে একটু ভিতরেই ঢুকেছিল। তারপর বসা। তারপর ছেড়ে দেয়া। তারপর আরাম! কিন্তু যেই না বসেছে, অমনি ছোবল। লাগবি না লাগ লেগেছে সেটা অণ্ডকোষে!

'যেইরাম পাপকাম করে বেড়াচ্চে গত মাসকয় ধরে, এ তারই ফল' মনে হচ্ছে আব্বাসের স্ত্রীর। চিবিয়ে চিবিয়ে দুবার সে বলেওছে কথাটা। শোনার পর থেকেই তওবা করছে আব্বাস। সেরে উঠলে আর অমন কিছু করবে না। প্রতিজ্ঞা করছে। কিরে কাটছে আল্লাহর নামে।

ছেদুর অবশ্য তা মনে হচ্ছে না। 'পাপের শাস্তি হলি ওর জাতসাপই কামড়াত। তালি সাতে সাতেই দফারফা। উটে বাপের নামও নিতি পারত না। এইডা সেরাম কিচু না' এক দেখাতেই বুঝেছে এটা ঢোঁড়াসাপের কাজ। একটুখানি আঁচড় লেগে আছে। বিষধর সাপ হলে দেড় আঙুল ফাঁক দিয়ে দুটো খোঁচার চিহ্ন থাকত।

'ইরাম না হলিই যে সিডা বিষাক্ত সাপ না, সিডাও বোলা যাবে না' গুরুজি শেখাচ্ছিলেন একদিন।

'তালি কিরাম করে বোজবো কোনডা বিষির, কোনডা না?'

রহস্যের হাসি হেসেছিলেন নাগরাজ। 'সিডাই তো মোজা। কামড়ের জাগাডার রং বইদলি যায়। ধর, কাইলচি হুয়ি গ্যালো, বা নীলি হুয়ি গ্যালো। বা ফুলি গ্যালো জাগাডা। কিংবা ধর ফোস্কা পইড়লো আর কিছুপরে পচন ধুরি গ্যালো।'

মজার ব্যাপার হলো, আব্বাসের নিম্নাঙ্গ এবং আশপাশের জায়গাটা ফুলে গেছে। রংটাও মনে হচ্ছে নীলের কাছাকাছি। তবু ছেদু জানে এটা বিষের কাজ না।

গুরুজির শেখানোর ধরন ছিল অন্য রকম। একটা শিক্ষাও তিনি মাগনা দেবেন না। একটা সাপ, একটা ওষুধ। একটা কাজ, একটা জ্ঞান। শর্তটা মানতেন কপাললেখার মতো। ইয়া বড় একটা গোখরো সাপ ধরে দিলে তবেই পরেরটুকু ছেড়েছিলেন।

'এসব হলিও নিচ্চিত বোলা যাবে না যে বিষিরই ক্রিয়া', হাসি মাখিয়ে বলেছিলেন। 'রঙ বদল তো নানা কারণেই হতি পারে। দংশন হলি পর মানুষ হইন্যি হুয়ি কত কীই না করে! যেমন ধর জাগাডা ছুরিদে কাইটি দেয় মন্দ রক্ত ঝুরি যাবে মনে কুরি। গিরুর পর গিরু দেয় যাতে বিষডা না ছুড়ায়। কাজের কাজ তাতি তো হয়ই না, উল্টু রক্ত চুলাচল যায় বন্দ হুয়ি। আবার মনে কর কেউ কেউ আছ দুদিনির বৈরিগী ভাতের অন্ন না কলি হজম হয় না, তারা দিকা গেল এসিট টেসিট দে জাগাডা পুড়াই ফেইললো বিষ পুড়ি যাবে মনে কুরি। কিংবা চিকিসসা কত্তি গে গাছড়ার রস মাখাই রাইকলো, তা হলিও বলো ও জাগার রং বইদলি যাবে বা পচন ধরবে! বুজলি কিবা?'

গুরুজির সেই হাসিটাই এখন হাসতে ইচ্ছে করছে ছেদুর। আব্বাস আলির এক সাগরেদ মাতব্বরী করে অণ্ডকোষের গোড়ায় গিঁট দিয়েছে একটা। এমনই কষা গিঁট, বেচারা দম নিতেও পারছে না ঠিকমতো। অথচ বিষক্রিয়া হলে, এই দুই ঘণ্টা হতে চলল, ওর তো চোখে ঝাপসা দেখার কথা। সবকিছু ডাবল দেখার কথা। ঘাড়মাথা অবশ হয়ে পেছনে ঝুলে যাওয়ার কথা। নিদেন পক্ষে মাথা ঘোরানো আর বমি তো হওয়ারই কথা।

এই শিক্ষাটা অবশ্য গুরুজি দেননি।

গুরুপত্নি ওকে খাতির করত খুব। গুরুজি বাড়ি না থাকলে সেটা বেড়ে যেত আরও। একাজ সেকাজ কতকিছু করতে হতো ওকে! গুরুজির মতোই তখন চালাকি করত তখন ও। প্রতিটা কাজের জন্য একটা করে প্রতিদান দিতে হবে। কতকিছু যে এভাবে বাগিয়ে নিয়েছে ছেদু, তা আর না বলে।

গুরুজি যে একটা ভণ্ড তা গুরুপত্নিই বলেছিলেন। বলেছিলেন আরও আরও ওঝাঁ যারা আছেন তাদের প্রায় সবাই অমন। অবাক হয়েছিল ছেদু। মানতে পারেনি কথাটা।

'ভণ্ড হলি এত এত রুগি সব সারে কিসির জোরে?'

'শোনো হাঁদারাম, গাঁও গিরামে যিসপ সাপ আছে তার দশডার ধরো সাড়ে নডাই তুমার গুরুর মতো, বুজদি পারিচাও, বিষ নেই শুদু ফনাই সার!' বলে হেসে উঠেছিল সে। হাসির কোথায় যেন মেঘ ছিল লেপ্টে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

'সাপেকাটা রুগি যত আসে তার সবই প্রায় হাওয়ায় হাওয়ায় বাচে। তুমার গুরু শুদু মিচেমিচি ঝাড়ফুঁক তাকতুক করতি থাকে আর এমন ভাব মারে যেন লখিন্দরের বিষও ও-ই ঝাড়াইলো!' গুরুজির মতো হাসার ভান করে ব্যর্থ হয়েছিল গুরুপত্নি। ছেদুও বিশ্বাস করেনি কথাটা। কিন্তু এই বছর দশেকের ওঁঝাজীবনে নিজেই প্রমাণ পেয়েছে। বাঁচতে মানুষের ওষুধ লাগে না। লাগে বিশ্বাস। আজকের এই আব্বাস রাজাকারও তার চিকিৎসায় বেঁচে যাওয়া রোগির খাতায় নাম লেখাবে। ভাবতেই হাসি পেল।

করুণ স্বরে কঁকাচ্ছে আব্বাস। 'ভাই তুই আমার ঠিক করে দে, যা চাবি আমি তাই দোবো। আল্লার কিরে।'

এই কথা ব্যাটা আগেও ক'বার বলেছে। চাইলেই যদি পাওয়া যায়, তবে চাইতে হবে ভেবে চিন্তে। চোখ বুজে তা-ই ভাবছে ও। কী দাবি করা যায়। কী চাওয়া যায়। ভাবছে তো ভাবছেই। কিন্তু মাথায় ছাই আসছে না কিছু।

পথের গায়েই রামপুর ইশকুল। আসার সময় তাকাচ্ছিল ভয়ে ভয়ে। বাগদি পাড়ার মেয়েগুলোর একটাকে না একটাকে দেখা যাবে এই ছিল ওর আশা। কিন্তু না, কাউকে দেখা গেল না। অত সকালে অবশ্য ঘুমিয়ে থাকারই কথা সবার। ছেদুও তো ঘুমিয়েই ছিল, না হলে এই সময় কেউ কাওকে ধরে আনতে পারে! অবাক লাগছিল। কী মরাঘুম ঘুমিয়েছে ও, মিলিটারি যদি যেত, জায়গায় মেরে ফেলত না? তখনই চোখ পড়েছিল ইশকুলের সামনের কৃষ্ণচূড়া না

সোনালু না কী একটা গাছের তলায়। একটা লায়েক মতো ছেলে বাঁধা তখনো। সারা গায়ে রক্তের দাগ। কত নিরীহ জনের কান্নায় ভিজে যে নোনতা হয়ে উঠেছে ওখানকার মাটি, কতজনের শেষ নিঃশ্বাস যে মিশে আছে গাছগুলোর শুকনো ফাটা চামড়ার ফাঁকে ফাঁকে তার ইয়ত্তা নেই। সব ওই আব্বাস আর আজমের কাজ। শিউরে উঠেছিল গা। কিন্তু কে লোকটা? চেনা যায়নি দূর থেকে। চেনারই বা কী দরকার? যে-ই হোক, মানুষ তো! বাঙালি তো! লোকটাকে ছাড়িয়ে নিতে পারে ছেদু। কিংবা বাগদি পাড়ার মেয়েগুলোনরেও ছাড়ানো যায়। হ্যাঁ এইটা একটা কাজের কাজ হবে। এ ব্যাপারে তাই কথা বলেছে ও আব্বাসের সাথে। আব্বাস বলেছে কাউকে ছাড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। তার শুধু ধরে দেওয়াই কাজ। কাকে মারবে কাকে ছাড়বে আর কাকে নিয়ে ফুর্তি করবে এসব হুজুরদের বিবেচনা। তবে সে অনুরোধ করে দেখবে। ছেদুও কম যায় না। ওর মতো দামদর করতে পারা লোক ওদের সারা বাজারে আর নেই। রোগির পাশ থেকে উঠে যাওয়ার ভান করেছে। 'তালি আমি যাই। শুদু শুদু সুমায় নষ্ট করব না। অনেক কাজ পড়ে আচে। ক্যাম্পের বাগানে নাকি এ্যাট্টা সাপ পাওয়া গেচে। ধরতি হবে।' বলেই উঠে দাঁড়িয়েছে। চেলাপেলারা হৈ হৈ করে থামিয়েছে তখন। ইশারায় রাজি হতে বলেছে আব্বাসকে। আব্বাসও রাজি হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকেই মন বদলে গেছে ছেদুর। ওই লোকটা বা মেয়েলোকগুলোকে ছাড়ানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার আছে।

ঠাকুরদা একটা গল্প করত প্রায়ই। 'কেষ্টপুরির লোকজন চান্দা তুলেচে, যাত্রা দ্যাকপে। যে সে যাত্রা না, যাত্রাদল ভাড়া করে আনা হলো শহরেত্তে। কী যে ভীড় হইল মানুষির সেবার! যেন সব হুমড়ি খেয়ে পড়েচে। পালাডাও মনে কর সেরাম! নায়কার ছিল সাপ পুষার বাতিক। তো পালা চলচে। নায়কা গান করচে। সাপ খেলা দেকাচ্চে। সাপ নিয়ে গায় জড়াচ্চে। চুমু খাচ্চে। নানা কিছিমির কীত্তিকলাপ। সাপটা হটাৎ ছোবল দিল নায়কার বুকি। সে কী ভয়ংকর পরিস্তিতি! লোকজন সব হাঁ হয়ে আচে। একটা ঘাস ভাঙলিও পট করে শব্দ শুনা যাবে এরাম নীরাবতা। মঞ্চের উপর গড়াগড়ি খাচ্চে নায়কা। গড়াগড়ি খাচ্ছে সাপ। আমরা তো মনে করিচি পালারই অংশ। কিন্তু না, একসময় খেয়াল হলো, নায়কা উটে বসেচে, সাপটা নড়ে না আর! চিন্তা করা যায়! নায়কার বুক দংশন করে মরে গেল সাপ, নায়কার কিচুই হলো না!'

সত্যি না মিথ্যে জানার উপায় নেই। ঠাকুরদা বলত খুব রসিয়ে। এমন ভাবে, যেন জীবন্ত দেখতে পেত ছেদু। নায়িকা নাচছে। তার পেছন দুলছে। বুক দুলছে। দুলছে তার হাতে থাকা সাপ। সাপের মুখে চুমু খাচ্ছে নায়িকা। আর সাপটা হঠাৎ হিস করে ছোঁবল দিচ্ছে নায়িকার বুকে। ছবির মতো ভাসে ঘটনাটা।

পোষা নির্বিষ সাপ যেহেতু, নায়কার তো না মরারই কথা, কিন্তু সাপ মরল কেন?

'কেন আবার! নাইকার গায় নিচ্চয় বিষ ছিল। না হলি আর কি?'

এই ছিল ঠাকুরদার সমস্যা। এমন সব কথা বলত, মনে হতো পাগল প্রলাপ! আচ্ছা, মানুষের গায়ে বিষ থাকে কী করে? তর্ক জুড়েও লাভ হয়নি। নায়কার গায় বিষই ছিল। গোঁ ধরে বলছিল ঠাকুরদা। তবু বিশ্বাস হয়নি ছেদুর। কিন্তু 'গরিবির কতা বাসি হলি ফলে'। ঠাকুমার কথাটা মনে পড়ছে আজ। আব্বাস রাজাকারকে সেই নায়িকার মতোই বিষধর মনে হচ্ছে ছেদুর।

রোগীকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে উঠোনের মাঝখানে। শীতল পাটির উপর একটা নতুন কাঁথা বিছানো। বালিশ নেই। চেলাপেলারা বলেছিল তেজপাতা গাছের ছায়ায় পাটি পাতার জন্য। না, তা করা যাবে না। টানা রোদে সাপের বিষ নড়তে পারে না। উঠতে পারে না। নামানো সহজ হয়। তাই ভ্যাপসা গরম আর রোদ আর মরণের ভয়ে নেতিয়ে পড়েছে আব্বাস। সারাগায়ে তার গাছড়ার বাড়ি মারছে ছেদু, খিস্তিখেউড় গাইছে, সাপের মা বাপ তুলে গাল দিচ্ছে, আর ভাবছে এসব। ভাবতে ভাবতেই চলে গেল ও গুরুজীর কাছে। গুরুজী তখন ওকে আর গুরুপত্নীকে নিয়ে বসেছেন।

ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমের ভাপওড়া সকাল ছিল সেটা।

আগের ক'দিন বাড়ি ছিলেন না গুরুজী। ওষুধ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। দুদিনের জন্য। কিন্তু দেরি হচ্ছিল ফিরতে। গুরুপত্নী বলেছিলেন ওষুধ খুঁজতে তো না, গুরু যায় তার আরেক বউর কাছে। সেই বউ আসতে দিচ্ছে না তাই দেরি হচ্ছে। অমন অবশ্য প্রায়ই হতো। প্রায়ই সপ্তা দুসপ্তা বাড়ি থাকত না গুরুজী।

একা থাকতে ভয় করে গুরুপত্নীর। ঘুম আসে না। মাঝরাত পর্যন্ত তাই পাহারা দিতে হয়। গল্প বলতে হয়। গান গাইতে হয়। ঘুমুলে তবেই ছুটি। রাতের শেষাংশটুকু নিজের ছাপড়ায়ই কাটাত ছেদু।

দুপুর নাগাদ রওনা হয়েছিল গুরুজি। বেশি দূরের পথ না। সন্ধ্যা উৎরোলে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু পথে এক রোগীর সন্ধান পেয়ে থামতে হয়েছিল তাকে। ফিরতে তাই রাত। তবে তখনো ছুটি হয়নি ছেদুর। দরজা খুলতে তাই দেরি হয়েছিল গুরুপত্নীর। গুরুজীর পায়ের ধুলো নিতে গিয়েই ছেদু বুঝে নিয়েছিল যা বোঝার। কিন্তু যেটা ভাবতে পারেনি, সেটাই ঘটেছিল পরসকালে। লাল টকটকে চোখে তাকিয়ে ছিলেন গুরু ওর দিকে। পাশেই বসা গুরুপত্নী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিলেন। কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। গুরুজীর স্বর কিন্তু অস্বাভাবিকরকম স্বাভাবিক ছিল! অবাক লাগছিল শুনতে।

এটা সেটা ওটা নিয়ে নাড়তে নাড়তে শেষে প্রশ্নটা করেছিলেন গুরু। 'তোর এ্যটটা সুযুগ দোবা হইলো, এ্যটটা রোগীকে সারাইত পারবি না নলি রোগডা নির্মূল করতি পারবি। এ্যটটা কোরলি আরেটটা কোরা যাবে না। কোইনডা করবি?' বলেছিলেন উত্তরের উপরই নির্ভর করছে ছেদুর আর গুরুপত্নীর ভাগ্য। উত্তর দেয়াটা সহজ তাই ছিল না সেদিন। বুঝে উঠতে পারছিল না কী উত্তরে কী শাস্তি। শাস্তিটাই বা কার। নাকি দুজনেরই। দরদর করে ঘামছিল ছেদু- এখন যেমন ঘামছে আব্বাস রাজাকার। তার চোখের দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার খিস্তি উজাড় করে দিচ্ছে ছেদু। সাপের মা বাপ চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে সে। আর মনে মনে হাসছে। সাপের বিষ যদি সত্যিই থাকত, এই গাল শুনেই ঝরে যেত গা বেয়ে! যেমন করে ওর সমস্ত সাহস আর বুদ্ধি সেদিন ঝরে পড়ছিল ঘামের স্রোতে।

সামনে লাল-চোখ মাতাল গুরুজি আর পাশে কাঁপতে থাকা গুরুপত্নির চেহারা মনে পড়ল আবার। ঠিক করে উঠতে পারছিল না কী করবে। রোগটাকে নির্মূল করলে রোগীটা বাঁচে না। কারণ আগে থেকেই আক্রান্ত সে। আবার রোগীকে বাঁচাতে গেলে রোগ বেঁচে যায়, পরে নানাজনের মরার আশংকা। সময় হয়ে আসছিল। উত্তর একটা দিতেই হতো। তাই ছুড়ে দিয়েছিল ঢিল একটা অন্ধকারে। শুনেই থমকে গিয়েছিল গুরুজী। পাথুরে স্বরে বলেছিল, 'মিলা শিষ্যুকে শিখুইচি, তোর মতো ধুরুন্ধুর আর এ্যটটাও দেকিনি।' তারপর বের করে দিয়েছিল। আর যেন ছেদুর মুখ দেখতে না হয় তার।

কী করবে কী করবে না বুঝতে পারছিল না ছেদু। সংশয় আর বিস্ময়ে ডুবে থাকা ভারী পাদুটো বাড়িয়েছিল ধীর পায়ে। কিছুক্ষণ পরই চিৎকার শুনেছিল একটা। পেছন ফিরে দেখে পড়ে আছে গুরুপত্নী। ফিনকি ছুটছে গলা দিয়ে।

কী নৃশংস! চোখ বুজে আসে ভয়ে। এখনো।

চোখ বুজেই থাকল কিছুক্ষণ। তারপর যখন খুলল, চোখদুটো তখন লোহিত সাগর! গুরুজিই যেন তাকিয়ে আছে ওর চোখের ভেতর দিয়ে। লাল টগবগে আগুনরাঙা চোখ তখন আব্বাস রাজাকারের দিকে। মুখভরা আদিরসাত্মক খিস্তিখেউড়।

ছেদু ভালো করেই জানে, সেদিন সে ভুল বলেছিল। আসলে একজন রোগীকে সারানোর চেয়ে রোগটাকে মেরে দেয়াই কাজের।

সাপের বিষ নামানোর কোনো ওষুধ ওকে শেখায়নি গুরুজী। তার আগেই শেষ হয়ে গেছে ছাত্রজীবন। তবে মানুষ মারার ওষুধ ও ঠিকই শিখেছিল। কিন্তু সমস্যা হলো ওষুধটাতে মরণ হয় আরামে। আরামের মরণ সবার জন্য না।

আরামের হোক, বা ব্যারামের, মরণের কথা উঠছে কেন?

মৃত্যু তো ঘুমেরই মতো। ঘুম তো মৃত্যুরই মহড়া। সময় হলে আসে। সারাবেলা জ্বালিয়ে রাখা স্বার্থের আলো নিভিয়ে মানুষ শুয়ে পড়ে, আশা পরে আবার উঠবে, কিন্তু ওঠে না। সারাজীবন অন্যায় অত্যাচার করেছে, সুখে থেকেছে, মরার সময় মরল, সে তো ভালো মানুষও মরে- এ আর এমন কী! শাস্তি হিসেবে মৃত্যু তাই হালকাই শুধু না, অন্যায্যও। শাস্তি হতে হলে তাকে শাস্তিই হতে হবে, মৃত্যু না। হতে হবে এমন কিছু ভোগ করতে হবে। যাতে সে বাঁচবে কিন্তু বাঁচবে না! মরবে কিন্তু মরবেও না!

ভাবতে থাকে ছেদু। ভাবতেই থাকে। একেকটা সিদ্ধান্ত নেয়, আর বাতিল করে। সুতোয় বাঁধা চরকির মতো ঘুরতে থাকে মন। স্থির হয় না। কিন্তু চিকিৎসা তো করতে হবে! আব্বাসের অণ্ডকোষের বাঁধনটা তাই এঁটে দেয় আরেকটু। চলতে থাকে খিস্তিখেউড় আর মন্ত্র পড়া। চলতে থাকে অভিনয়।

সূর্যের চুল্লিতে কেউ বোধহয় ঘি ঢেলেছে। খাঁটি গাওয়া ঘি! রোদটা তাই চড়ে যাচ্ছে। চড়েই যাচ্ছে। ভালোই হলো। বিষ পোড়াতে এমন নরকাগ্নিই তো লাগে। তাছাড়া আব্বাস মুসলমান, মুখাগ্নি হবে না, বেঁচে থাকতেই হয়ে যাচ্ছে!

ঠোঁটের কোনায় হাসি লুকিয়ে চোখের কোনা দিয়ে তাকায় ছেদু। তখনই কেমন ঘুরে ওঠে মাথাটা। পড়ে যায় ও। কী হলো।

পুরোনো মৃগী রোগটা কি ফিরে এল আবার? তাহলে তো দাঁত লেগে যাবে এখন। কাঁপতে থাকবে চালু হওয়া শ্যালোমেশিনের মতো। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। ক'দিনের না-খাওয়া দেহ, টানা রোদের ধকল নিতে পারেনি। স্বস্তিটা বোধ হয়েছে কি হয়নি, অমনি একটা লাথি খেল মাথায়। অন্ধকার হয়ে গেল চোখজোড়া। মুখের উপর আগুনপারা রোদ। কে মেরেছে দেখা গেল না তাই। তবে তার গলা শোনা গেল। 'খবরদার, কোনো চালাকি করবি না, মালাউনের বাচ্চা। হুজুরির কিচু হলি, তোরে জ্যান্ত পুড়ায়ে ফ্যালব।'

দম আটকে আসে ছেদুর। দাঁড়াতে চেষ্টা করে সে। টলে পড়ে যায় আবার। অসহায় চোখে তাকায়। চারপাশে রাজাকারের দল। একটা হাত এগিয়ে আসে তাকে তোলার জন্য। কিন্তু ছেদু ঠিক করতে পারে না, রাজাকারের হাত ধরে ওঠাটা ঠিক হবে কি না।

ভালো উপদেশ রুবির চেয়েও দুষ্প্রাপ্য

মূল: সালমান রুশদি
অনুবাদ: মিলন আশরাফ

মাসের শেষ মঙ্গলবার। ভোর বেলা। জ্বলজ্বল করছে বাসের হেডলাইটগুলো। ব্রিটিশ দূতাবাসের উদ্দেশে রওনা হয়েছে মিস রেহানা। আকাশের মেঘগুলো তার দিকে ধেয়ে আসছে। অচেনা কারও চোখে মেয়েটির সৌন্দর্য মেঘ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত পড়বে না। রাস্তায় দাঁড়ানো বাসটার গা ছিল আরবীয় নকশা অনুযায়ী বহুবর্ণের চিত্রে শোভিত। সামনে লেখা ছিল 'সরে যাও প্রিয়তমা'। সেটা ছিল সবুজ ও স্বর্ণ অক্ষরে। পেছনের দিকটাতে লেখা ছিল, 'টাটা-বাটা' এবং 'ওকে গুড লাইফ'। মিস রেহানা ড্রাইভারকে বলল, এটা খুব সুন্দর বাস। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার লাফ দিয়ে বাসের দরজাটা খুলে দিল। সে না ওঠা পর্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখল ড্রাইভার।

মিস রেহানার চোখ দুটি বেশ বড় বড় ও কালো বর্ণের। যথেষ্ট উজ্জ্বলও। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না তার। উপদেশ বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদ আলী তাকে দেখেই নিজেকে তরুণ ভাবতে লাগল। রেহানার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। দূতাবাসের দরজার সামনে গাড়ির শক্তিশালী আলো জ্বালিয়ে শ্মশ্রুধারী লোকটাকে (যে কীনা পরে ছিল খাকি পোষাক এবং তার মাথায় ছিল ফুলের তৈরি পাগড়ি) রেহানা জিজ্ঞেস করল, 'কখন খোলা হবে গেটটা ?' তারা সাধারণত মঙ্গলবারে আসা মহিলাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে কিন্তু মিস রেহানাকে ভদ্রভাবে বলল, 'এই ধরুন আধা ঘন্টা লাগবে আবার দু'ঘন্টাও লাগতে পারে। কে জানে কতক্ষণ লাগে আজ ? সাহেবরা সব নাস্তা করছেন এখনো।'

ইতোমধ্যে বাস স্টপেজ ও দূতাবাসের মাঝখানে ধূলিমিশ্রিত প্রাঙ্গনে মঙ্গলবারে আসা মহিলাদের গাদাগাদিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কিছু মহিলা বোরখা পরিহিত। বাকিরা নির্লজ্জ পোশাকে। মিস রেহানাও বাকিদের মধ্যে। সবাইকে ভীতসন্ত্রস্ত লাগছিল। এবং তারা তাদের ভাই অথবা চাচাদের বাহুর মধ্য থেকে আত্মবিশ্বাসী চোখে তাকানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু রেহানা এসেছিল একা এবং তাকে তেমন অধীর মনে হচ্ছিল না।

মুহাম্মদ আলী (যে কিনা উপদেশ বিশেষজ্ঞ) তাকে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ লাগছিল। সাপ্তাহিক অনুণয়কারীর মতো সে বড় বড় চোখে এই অদ্ভুত স্বাধীনচেতা বালিকার দিকে তাকিয়ে ছিল।

'মিস, আমার মনে হয় আপনি লন্ডনে পারমিটের জন্য এসেছেন' বলল মুহাম্মদ আলী।

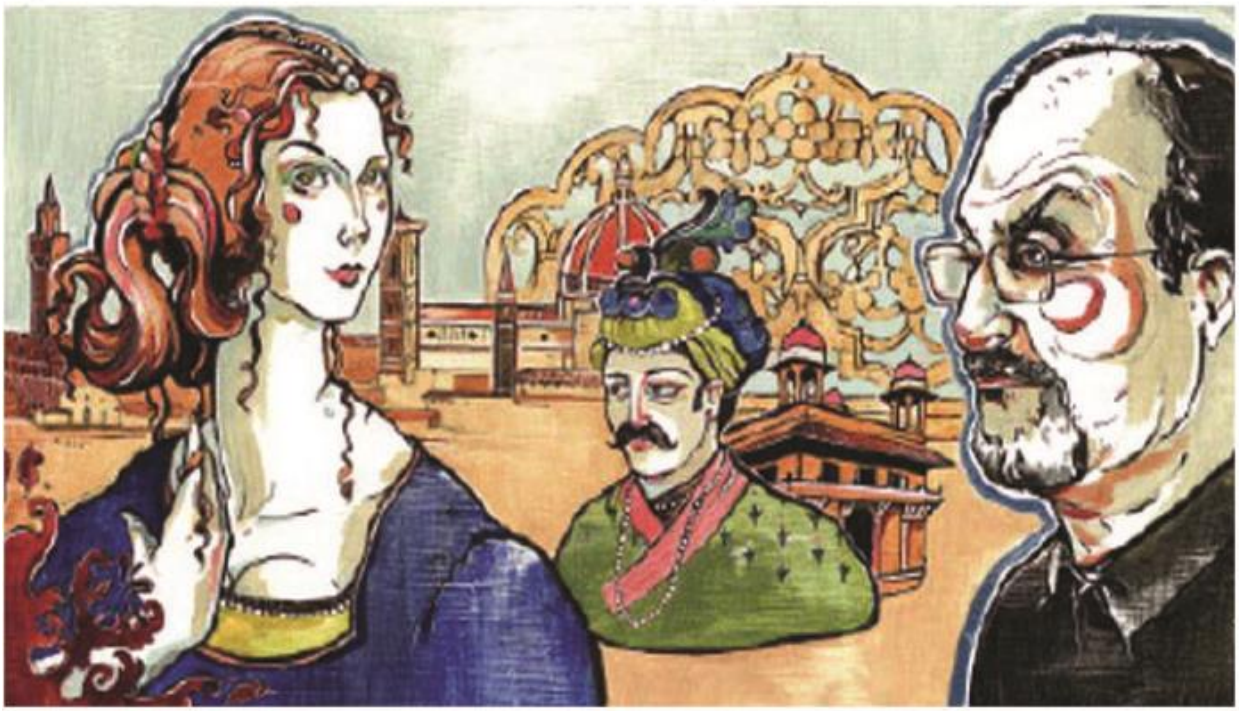

রেহানা দাঁড়িয়েছিল শহরের ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরের মতো হট জলখাবারের দোকানের সামনে। মুখের ভেতর চিলি-পাকোরা চাবিয়েও শান্তি পাচ্ছিল না সে। রেহানা ঘুরে তাকাল মুহাম্মদ আলীর দিকে। ভাবল, লোকটার তাকানো পরিপাক নালীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

সে উত্তর দিলো, 'জি, হ্যাঁ। এবার আপনি দয়া করে যদি কিছু ভালো উপদেশ দিতেন অল্প খরচে।' *(বাকি অংশ পড়তে মূল ওয়েব পোর্টাল www. the report 24.com ভিজিট করুন।)*

মিস রেহানা এরপর হাসিমুখে বলল, 'ভালো উপদেশ রুবির চেয়েও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু হায়! আমি আপনাকে তেমন কিছুই দিতে পারবো না। কারণ আমি একজন এতিম বালিকা। আপনার অন্যান্য ধনী মহিলার মতো নই।'

'আমার এই ধূসর চুলের কসম' রেহানা বলল। মুহাম্মদ আলী বুঝতে পেরেছে এই মর্মে সম্মতি জানালো।

'আমার পরামর্শগুলো আমারই অভিজ্ঞতার ফসল। আপনি অবশ্যই এটা থেকে লাভবান হবেন' মুহাম্মদ আলী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালো।

মিস রেহানা মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, 'আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আমি একজন সস্তা শ্রেণির মানুষ। এখানে আপনি অনেক মহিলা পাবেন পুরো পরিবারসহ। তাদের রোজগারও বেশ ভালো। তাদের কাছে যান। ভালো উপদেশের বিনিময়ে ভালো অর্থ পাওয়া উচিৎ।'

'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?' মুহাম্মদ আলী ভাবল। কারণ সে তার নিজের কণ্ঠে নিজের ইচ্ছার কথা বলেছিল। 'মিস, ভাগ্যই আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। কী আর করার আছে বলুন? আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বেই লিখিত ছিল। ভয় পাবেন না। আমিও গরীব সুতরাং আপনার জন্য আমার উপদেশ সম্পূর্ণ ফ্রি!'

রেহানা পুনরায় হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে তো অবশ্যই শুনতে হয়। আমার ভাগ্য যেখানে এটা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। আমার জন্য এটা তো সৌভাগ্যও বটে।'

মুহাম্মদ আলী তাকে শহরের এককোণে কুঁড়েঘরের এক নিচু কাঠের তৈরি ডেস্কের কাছে নিয়ে গেল। রেহানাও খবরের কাগজের প্যাকেটে রাখা পাকোরা খেতে খেতে তার পিছু নিল। মুহাম্মদ আলীকে খাওয়ার জন্য একবারও বললোও না।

মুহাম্মদ আলী ধুলোমিশ্রিত মেঝেতে একটা কুশন পেতে বসতে দিল তাকে। মেয়েটা কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই বসে পড়ল। মুহাম্মদ আলী পায়ের উপর পা আড়াআড়ি রেখে টেবিলে বসল তার সামনেই। দুই থেকে তিন ডজন মানুষ তাকে দেখে খুব ঈর্ষান্বিত হচ্ছিল। কুঁড়েঘরের বাকি সদস্যরা নতুন আসা এই সুন্দরীর ধূসর চুলের ফাঁদে পড়ে কটাক্ষ করতে লাগল। মুহাম্মদ আলী নিজেকে কন্ট্রোল করে গভীরভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'দয়া করে নামটা বলুন।'

'মিস রেহানা' বলল মেয়েটা এবং সে আরো জানালো ব্রাডফোর্ড লন্ডনের বাসিন্দা মুস্তাফার দার বাগদত্তা।

'ব্রাডফোর্ড, ইংল্যান্ডে' শান্তভাবে সে বিষয়টা সংশোধন করে দিলো। 'লন্ডন শুধুমাত্র একটি শহর ঠিক মুলতান কিংবা ভাওয়ালপুরের মতো। কিন্তু ইংল্যান্ড হলো মহান জাতি ও পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ।'

'ধন্যবাদ। আমি বুঝতে পেরেছি' খুব গুরুত্বসহকারে রেহানা জবাব দিল। যদি সে তার সঙ্গে মজা করে বলতো, তাহলে তার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাতো না।

'আপনার দরখাস্ত পূরণ করে তারপর দয়া করে আমাকে দেখান' মুহাম্মদ আলী বলল।

রেহানা বাদামি কাগজে মোড়া একটা খামে ভাজ করা কিছু কাগজ দেখালো।

'এটা কি ঠিক আছে?' এই প্রথম তার কণ্ঠে উদ্বেগ জড়িয়ে আলীকে বলল।

আংটাওয়ালা কাঠের পা বিশিষ্ট একটা ডেস্কের কাছাকাছি জায়গার রেহানার হাত রাখা ছিল বিশ্রামের জন্য।

'হুম একটু অপেক্ষা করুন। আমি অবশ্যই এটা চেক করবো' আলী বলল।

কাগজপত্রগুলো স্ক্যান করে দেখার আগেই পাকোরা খেয়ে শেষ করল রেহানা।

'চুপচাপ থাকুন, আমি পরবর্তী আদেশ দেওয়া না পর্যন্ত।'

'আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।' আপনি এটা ম্যানেজ করুন। আমি এখন যাবো এবং গেটের বাইরে অপেক্ষায় থাকবো।

'আপনি কী ভাবছেন?' চিৎকার করে কপালে আঘাত করতে করতে জিজ্ঞাসা করলো মুহাম্মদ আলী।

'আপনি কি এটা সহজ ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করেন ? শুধু ফর্মটা দিন। ডং করে একটু হাসুন। তারা সঙ্গে সঙ্গে পারমিট দিয়ে দেবে? 'মিস রেহানা, আমি আপনাকে বলছি, আপনি যেকোন থানার চেয়ে খারাপ জায়গায় এসেছেন।' 'এটা সত্যিই তাই?' তার কথাবার্তা হাস্যকর প্রতিপন্ন হচ্ছে। রেহানা এখন বন্দি শ্রোতা এবং মুহাম্মদ আলী কয়েক মুহূর্তের চেয়ে বেশি তাকে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

মুহাম্মদ আলী ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার মুখস্ত কথাগুলো বলা শুরু করলো। সে বলল, 'সাহেব ভেবেছিলেন যে, যেসকল মহিলারা মঙ্গলবার আসেন তারা লুটনের বাস ড্রাইভার অথবা ম্যানচেস্টারের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসদের মতো অসৎ ও মিথ্যাবাদী।'

তিনি প্রতিবাদ করলেন, 'কিন্তু আমি তাদেরকে বলবো আমি ওই দলের নই।'

তার সরলতাই তার বিপদের কারণ। মুহাম্মদ আলী তাকে বলল, 'তিনি তাদের কাছে চড়ুইয়ের মতো। শকুনের ন্যায় চোখ করে তারা তার দিকে তাকাবে।' সে আরো ব্যাখ্যা করল যে, তারা তার কাছে একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবে সে প্রশ্নগুলো এতোই ব্যক্তিগত যে, যেকোনো মেয়ে নিজের আপন ভাইও সেগুলো শুনে লজ্জা পাবে। তারা জিজ্ঞেস করবে, তিনি কুমারী কি-না এবং যদি না হয় তাহলে কার সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং গোপন মিলনের সময় একে অপরকে কী নামে ডাকে সেটাও জানতে চাইবে তারা।

মুহাম্মদ আলী খুব নির্দয়ভাবে কথাগুলো এইজন্য বলছিল যে, যাতে সে আঘাত পায়। কারণ আসল ঘটনা এর থেকেও ভয়ংকর হবে। রেহানা শান্তদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু তার হাত ডেস্কের একপ্রান্তে বেশ ছটফট করছিল। সে আবারও বলতে শুরু করলো, 'তারা আপনাকে আরো জিজ্ঞেস করবে, বাড়িতে কয়টা রুম আছে, দেয়ালগুলো কি রঙের? কোন্ দিন আপনি ময়লা ফেলেন? আপনার মায়ের তৃতীয় চাচাতো ভাইয়ের চাচীর ধাপের কন্যার মাঝেটার নাম কি? ও হ্যাঁ, সব জিনিসের মধ্যে আপনার ব্রাডফোর্ডের মুস্তাফা দার কথাও জিজ্ঞেস করবে? যদি আপনি কোনরকম কোনকিছুতে একটি মাত্র ভুল করেন তাহলে আপনি একেবারে শেষ।'

'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি', সে বললো। তার কণ্ঠে অনুগতের সুর শুনতে পেল আলী। এবার বলুন, 'আপনার কী পরামর্শ। রেহানা জানতো চাইলো। এই সুযোগের অপেক্ষার সে ছিল এতোক্ষণ। মুহাম্মদ আলী ফিসফিস করে তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলতে শুরু করল, সে উল্লেখ করে বলল, 'সে এমন একজন লোককে চিনতো যে খুব ভালো মানুষ। দূতাবাসে কাজ করতো। তার মাধ্যমেই একটা নির্দিষ্ট ফি দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিক ছিলছপ্পর মেরে আনা হতো। ব্যবসাটা ছিল খুব ভালো তার। মহিলারা খুশি হয়ে তাকে প্রায়ই পাঁচশ রুপি অথবা কখনও কখনও তার কষ্টের কথা বিবেচনা করে তাকে সোনার ব্রেসলেটও উপহার দিয়ে তাকে খুশি করতো।'

তারা শত শত মাইল দূর থেকে তার কাছে আসতো। তাদেরকে ছলচাতুরি সম্পর্কে কাজ শুরুর আগেই নিশ্চিত করতো সে। কিন্তু তারা যখন বুঝতো যে, তারা প্রতারিত হয়েছে দুর্ভাগ্যবশত তখনই ফিরতো। তখন হয়তো তারা চলে গেছে সারগোধা অথবা লালুঘাট। সেখান থেকে আবার তারা ফিরে আসতো। এরপর তারা গাংচিলের মতো ছুটে আসতো তার কাছে। কিন্তু তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক...

জীবন খুব শক্ত এবং একজন বৃদ্ধ মানুষের বুদ্ধির দ্বারাই চলা উচিত। এটা মুহাম্মদ আলীর ভাবার কথা নয় কিন্তু মঙ্গলবার আসা মহিলাদের প্রতি তার একটা আলাদা সমবেদনা ছিল।

পুনরায় তার কণ্ঠ তাকে প্রতারিত করলো। গতানুগতিক বক্তৃতা বাদে সে তার গোপন বিষয় প্রকাশ করতে শুরু করলো।

'মিস রেহানা' সে বলে উঠল এবং এটা শুনে সে খুব অবাক হল। 'তুমি বিরল মানুষ। একটা খাঁটি রত্ন। আমি তোমার জন্য তাই করবো যা সম্ভবত আমি আমার মেয়ের জন্যও করতাম না। আমার কাছে একটা ডকুমেন্ট আছে যেটা তোমার সব দুঃশ্চিন্তা দূর করবে।'

'কী সেই জাদুকরী কাগজ?' জিজ্ঞাসা করলো রেহানা। তার চোখে এখন প্রশ্নহীন হাসি।

কণ্ঠে মলিনতা এনে সে বলল, 'মিস রেহানা এটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট। পুরো আসল এবং ভালো মাল। আমার একজন ভালো বন্ধু আছে যে তোমার নাম এবং ছবি দেবে। অতঃপর তুমি দেখবে সোজা ইংল্যান্ড মানে যেখানে তুমি যেতে চাও !'

সে আরো বলতে লাগলো, 'এখন সবকিছুই সম্ভব।' আজকের দিন তার পাগল হবার দিন। সে সম্ভবত তাকে এই জিনিসটা দিয়ে পরবর্তী এক বছরের জন্য নিজেকে এই কাজ থেকে লাথি মেরে সরিয়ে নেবে।

'বোকা বৃদ্ধ' বলে নিজেকে ভৎসনা করলো সে। বোকা বৃদ্ধরাই তরুণী বালিকাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

'আপনাকে বুঝতে দিন আগে' সে বলল। আপনি আমাকে অন্যায় করতে প্রস্তাব দিচ্ছেন।

' না, ঠিক অন্যায় নয়' বাধা দিয়ে বলল, মুহাম্মদ আলী।

'...এবং আপনি চান আমি অবৈধভাবে লন্ডনের ব্রাডফোর্ডে যাই। যার ফলশ্রুতিতে দূতাবাসের সাহেবের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো জানাই। ওল্ড বাবুজি, এটা মোটেই ভালো উপদেশ না।'

' ব্রাডফোর্ড লন্ডন নয়, ইংল্যান্ড' শোকার্তভাবে এটা সংশোধন করে দিলো সে।

'আমার উপহারটা এভাবে গ্রহণ করা আপনার ঠিক নয়।'

'কীভাবে?'

'বেবি, দেখো আমি একজন গরীব সহকারী। এবং আমি তোমাকে এই সুযোগটা দিচ্ছি কারণ তুমি খুব সুন্দরী। আমার এই মহত্বটার উপর তুমি থুথু ছিটাবে না। বিষয়টা ভাবো। অন্যথা যদি এটা গ্রহণ না করো সোজা বাড়ি যাও। ভুলে যাও ইংল্যান্ডের কথা। অযথা এই বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকে তোমার মর্যাদা খোয়াবে না।'

মিস রেহেনা তার দিক থেকে বাঁক নিয়ে গটগট করে গেটের দিকে চলে গেল। যেখানে মহিলারা সব জড়ো হচ্ছিল এবং তাদেরকে যাতে নেওয়া হয় এ বিষয় শপথ করে বলতে বলতে তারা প্রায় অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল।

'বোকা হয়ে যেও না' চিৎকার করে মুহাম্মদ আলী তাকে জানালো।

'আপনি যদি আমার বাবা হয়ে যান, তাহলে কি হবে?' (তার মানে এটা তার কাছে কি ছিল ?)

সে আর ফিরল না।

'এটা আমাদের জন্য অভিশাপ' চিৎকার করে বলল সে। 'আমরা গরীব। অশিক্ষিত। এবং আমরা পুরোপুরি শিখতে প্রত্যাখান করি।'

' হায়, মুহাম্মদ আলী!' পানের দোকানের সামনে যেতে যেতে এক মহিলা তাকে ইশারা করল।

ওইদিন মুহাম্মদ আলী কিছুই করলো না। কিন্তু সে দূতাবাসের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলছিল বারবার, 'এখান থেকে যাও। বৃদ্ধ বোকা। মেয়েরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। দূরে দূরে থাকো। '

কিন্তু যখন রেহানা ফিরে এলো, দেখলো, সে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

'সালাম উপদেশওয়ালা' তাকে অভিবাদন জানাল মেয়েটি।

তাকে দেখতে বেশ শান্ত দেখাচ্ছিল এবং তাকে দেখে খুব শান্তি লাগছিল। মনে মনে সে ভাবল, ইয়া আল্লাহ! সে যেন সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। ব্রিটিশ সাহেব তার চোখ নিচু করে তার দিকে তাকিয়েই তাকে নিশ্চয় ইংল্যান্ডের যাবার ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন।

তাকে দেখে সে আশান্বিত ভাবে হাসি দিলো। সেও দ্বিধাহীনভাবে হাসি ফেরত দিলো।

'মিস রেহানা বেগম,' অভিনন্দন বেটি। নিশ্চয় ওখানে তোমার জয়জয়াকর হয়েছে। ঝোঁকের বশে সে তার হাতটা তার হাতে রাখল।

'আসুন। আমাকে কিছু পাকোরা কিনে দেবেন এবং ধন্যবাদ আপনার সুন্দর উপদেশের জন্য। আর হ্যাঁ, আমার খারাপ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

ধূলিমিশ্রিত বিকেলের বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায় তারা। বাসগুলো তখন স্টেশন ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছাদের উপর বিছানা পাতার চেষ্টা করছে কুলিরা। যাত্রী দেখে চিৎকার করে লাভ স্টোরি বই এবং সবুজ ওষুধ বিক্রি করার চেষ্টায়রত হকাররা। সবকিছু মিলে অসুখী ভাবটা কেটে যাচ্ছিল। মিস রেহেনা এবং সুখী মুহাম্মদ আলী বাসের বাম্পারে বসে পাকোরা খাচ্ছিল। এবং অভিজ্ঞ উপদেশওয়ালা

মুহাম্মদ আলী, পুরানো এক সিনেমা থেকে একটা গান গাইছিল গুনগুন করে। দিনের সূর্য ততক্ষণে উধাও।

'এটা ছিল অ্যারেঞ্জ এ্যানগেজমেন্ট,' এই বলেই শুরু করলো মিস রেহানা। 'আমার বয়স যখন নয় বছর, তখন মা-বাব বিয়েটা ঠিক করে রেখেছিলেন। মুস্তাফা দার এখন ত্রিশ। কিন্তু আমার বাবা চেয়েছিলেন, এমন একজন যে, সত্যিই আমাকে যত্নে রাখবে টেক কেয়ার করবে। মানে আমার বাবা যেরকম ছিল আর কি। মুস্তাফা দার আমার দাদিজির মতে সেইরকমই একজন। এরপর আমার মা-বাবা দুজনই মারা গেলেন। মুস্তাফা চলে গেল ইংল্যান্ড। এবং এখন সে আমাকে নিয়ে যেতে চায় ওখানে। অনেক বছর আগে তার ছবি দেখেছি আমি। খুব অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে। এমনকি তার কণ্ঠও আমি ফোনে চিনতে পারিনি।' তার এই স্বীকারোক্তিতে মুহাম্মদ আলী খুব অবাক হল। কিন্তু সে মাথা নাড়াল জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতো।

'এখনো এবং শেষ পর্যন্ত, প্রত্যেক মা-বাবা নিজেদের পছন্দ মতো পাত্রই নির্বাচন করেন। তোমার জন্যেও তারা একজন সৎ ও আদর্শবান পাত্র দেখে রেখেছেন। তাদের কথা রাখার জন্যে তোমাকে তার কাছে যেতে হবে। এখন তুমি জীবনভর তাকে জানতে পারবে এবং ভালোবাসবে।

মুহাম্মদ আলীর মুখের হাসি তিক্ততায় ভরে উঠেছে এখন।

'কিন্তু ওল্ড ম্যান, কেন তুমি এরপরেও আমাকে বস্তাবন্দি করে ইংল্যান্ডে পোস্ট করে দিচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো রেহানা।

মর্মাহত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মুহাম্মদ আলী।

'তোমাকে সুখি দেখতে। আমি অনুমান করলাম.....

'দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে হচ্ছে তারা তোমাকে নিরাশ করেছে এবং কেন?'

'আমি তাদের সব প্রশ্নের উত্তর ভুল দিয়েছি, সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখেছে তারা। সবকিছুই উলোটপালোট করে দিয়েছি আমি। একেবারে যাকে বলে বাথরুম সজ্জা। সবকিছুই এলোমেলো।'

'কিন্তু এখন কী করা যায়? কীভাবে তুমি যাবে?'

'এখন আমি সোজা লাহোরে ব্যাক করবো এবং আমার কাজে যোগ দিবো। আমি ওখানে এক সুন্দর বাসায় কাজ করি সেখানে তিনটা ভালো ছেলে আছে। আসার সময় তাদেরকে খুব মন খারাপ দেখে এসেছি।'

'কিন্তু এটা একটা ট্রাজেডি!' দুঃখের সঙ্গে বলল, মুহাম্মদ আলী। 'ওহ্ আমি তোমার জন্য কত প্রার্থনা করেছি তুমি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করো। কিন্তু কি করি এখন তো এটা সম্ভব না, আমি তোমাকে আগেই অবহিত করেছিলাম। তারা এখন তোমার ফর্মটা ফাইলে রেখে দিয়েছে, ক্রস চেক তৈরি হয়ে গেছে এখন পাসপোর্টও কাজে লাগবে না। শেষ, সব শেষ! এটা কত না সহজই হতো যদি ঠিক সময়ে তুমি আমার উপদেশ গ্রহণ করতে।'

'আমি সেটা মনে করি না, আমি সত্যিই চাইনি তুমি কষ্ট পাও।'

এবার শেষ হাসি হাসল মিস রেহানা। এই হাসিটাই কম্পাউন্ড থেকে শুরুতেই দেখেছিল মুহাম্মদ আলী। একটা বাস এসে ধুলো উড়িয়ে সেটাকে গোপন করে ফেলার আগ পর্যন্ত তাকিয়েছিল সে। তার দীর্ঘজীবনের কর্কশ, অনুরক্তিহীন, কঠোর, ভালোবাসাহীন জীবনের এটাই ছিল সেরা সুখি মুহূর্ত।

লেখক পরিচিতি: বিতর্কিত লেখক সালমান রুশদি'র জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৯ জুন ভারতের বোম্বে, দেশবিভাগের ঠিক দু'মাস আগে। তাঁর মা-বাবা উভয়েই দিল্লীর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান ছিলেন। জন্মের নয়মাস আগে তাঁর মা-বাবা বোম্বে চলে আসেন। তরুণ বয়সে অভিনেতা হবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু তা পূরণ হয়নি। তার বদলে হলেন লেখক। ঔপন্যাসিক হিসাবে একাধিকবার বুকার পেয়ে নিজের সামর্থের পরিচয় দিলেও গোল বাধলো 'দি স্যাটানিক ভার্সেস' লেখার পর। বিশ্ব মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। এই ফতোয়া মাথায় নিয়েই তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন দীর্ঘদিন। পলাতক অবস্থায় থেকে তিনি রচনা করেন নতুন উপন্যাস 'দি গ্রাউন্ড বেনিথ হার ফিট।' অনুবাদকৃত ছোটগল্পটি গল্পসংকলন ইস্ট-ওয়েস্ট (১৯৯৪) থেকে নেওয়া।

দুনিয়া মিখাইলের কবিতা

তরজমা : মহিউদ্দীন মোহাম্মদ

[দুনিয়া মিখাইলের কবিতাগুলো খানিকটা ফোঁটা ফোঁটা জলের মধ্যে অপূর্ব এক স্রোতের মতো, যা একটা নতুন চেতনাকে উন্মোচন করে। তার সমস্ত লেখালেখির মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে ইরাকের বেদনা। ইরাকি মানস তার কাব্যচর্চায় নিরঙ্কুশভাবে রয়ে গেছে। তাই মার্কিন মুল্লুকে গিয়েও তিনি মাতৃভূমিকে মনে রেখেছেন। আশা করছি, পাঠক তার এই কবিতা থেকে অন্যরকম এক চেতনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবেন।

১৯৬৫ সালে বাগদাদে তার জন্ম। আশির দশকে তার লেখালেখি শুরু। তার কবিতার ভাষা অতি সরল। তবে তা হৃদয়কে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। কবিতা নিয়ে তার ধারণা হচ্ছে-প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার সঙ্গে ভাষার নিবিড় সম্পর্ক তৈরির একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের ভিটেবাড়ি, রাস্তাঘাট ও মানুষের হৃদয় তার কবিতার অন্যতম অনুষঙ্গ। ইরাকে কবিদের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক নারী। মিখাইল সম্পর্কে ইরাকের কবি ও খ্যাতিমান সমালোচক ফাদিল আল আজ্জাবি বলেন, 'তিনি তার সময়ের সেরা কবি। মিখাইলের কবিতা বিশুদ্ধ ও সুন্দর।'

দুনিয়া মিখাইল যুদ্ধক্ষেত্রের অনুষঙ্গগুলো ভালোভাবেই কলমবন্দি করেছেন। আশির দশকে ইরাক-ইরান যুদ্ধ ও উপসাগরীয় প্রথম যুদ্ধ তার কবিতাকে সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি মূলত লেখেন ইংরেজি ও আরবিতে। কবিতা ও গদ্য রচনার পাশাপাশি অনুবাদও করেন। পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবেও কাজ করছেন। পাশাপাশি তিনি ওকল্যান্ড ভার্সিটির আরবি সাহিত্যের শিক্ষক। বর্তমানে কবির নিবাস আমেরিকার মিশিগানে।

আরবিতে লেখা তার গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-২০১৭ সালে প্রকাশিত (ফি সুক আল সাবায়া), ২০০১ সালে প্রকাশিত আল হারবু তা'মালু বিজিদ্দি) ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় (আলা ওয়াশকিল মাওসিকি)। এছাড়া ইরেজিতে লেখা কয়েকটি গ্রন্থহলো: The Iraqi Nights (New Directions, 2014), Diary of a Wave Outside the Sea (New Directions, 2009), The War Works Hard (New Directions, 2005) তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বেশকিছু পুরস্কার রয়েছে ঝুলিতে।]

শিরোনামহীন

১০.
এতদিন আমাকে ভেবেছে লোকটা,
আমি তার ভাবনায় এসেছি ফিরে
সে যে একবারও গ্রহণ করেনি আমাকে
আমিও তাকে নয়
বৃষ্টি মুছে দেয় সেই রঙগুলো
এতকাল ঘিরে ছিল যারা তাকে
পুরনো ক্যানভাসে।

১১.
হারিয়ে যাওয়া স্বামীরা ফিরেছে,
ফেরেনি সে যুদ্ধবন্দিদের সাথে,
মেয়েটির কাছ থেকে নেওয়া সেই
ঘুড়িটির হদিস নেই,
অন্যকোনো খানে,
মেয়েটির স্বপ্নের ভেতরে,
যখন সে দাঁড়িয়েছিল হাসি হাসি মুখে
ক্যামেরার সমুখে
রয়েছে তাই পাসপোর্টে সাঁটা ।

১২.
আমাকে তোমার
চুম্বন পদ্ধতি:
সরণির পাশে
খেজুর রাশি রাশি।

১৩.
রাজকুমারি রাপানজেলের চুল
জানলা দিয়ে পড়েছে মাটিতে
আমরা কিভাবে বসে থাকি ঠাই।

১৪.
বন্দিদের বাঁপাশে দেয়ালে
ছায়া পড়েছে
তার সমস্ত একাকিত্বজুড়ে
জেলার আর প্রক্ষিপ্ত আলো।

(বাকি অংশ পড়তে মূল ওয়েব পোর্টাল www. the report 24.com ভিজিট করুন।)

১৫.
জন্মভূমি, আমি তো তোমার মা নই,
তবু আমার কাছে কাঁদো কেন
সবসময়
দুঃখ ব্যথায়?

১৬.
মনে কিছু করো না এই পাখি:
প্রতিদিন আসে
আর মগডালে বসে একাকী
দুই ঘণ্টা গান গায়।
আর কিছু করে না, এতেই সে সুখী ।

১৭.
ঘরের চাবি,
পরিচয়পত্র,
বিবর্ণ চিত্রমালা হাড়ের ভেতরে
সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে
একটা গণকবরে ।

১৮.
আরবি ভাষা ভালোবাসে দীর্ঘবাক্য
আর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ।
এ কখনো ভালোবাসে না
গানের শেষ কলি, গভীর রাত
আর ধ্বংস্তূপের ওপর কান্না।
এ ভালোবাসে একটা দীর্ঘ জীবন ও
একটা দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যু।

১৯.
বাড়ি থেকে এত দূর
আমাদের পাল্টে দিয়েছে
সাতসমুদ্দুর।

২০.
সিনড্রেলা তার চটি রেখে গেছে ইরাকে
সাথে চায়ের পাত্র থেকে এলাচের গন্ধ
এবং একটা বহৎপুষ্প,
তার মুখবিবর মৃত্যুর মতো।

২১.
তাৎক্ষণিক খুদে বার্তাসমূহ
সংগ্রাম উসকে দেয়।
তারা জ্বলে ওঠে নতুন আবাসে
অপেক্ষা করে একটি দেশ ডাউনলোড হওয়া পর্যন্ত,

একটা ভূমি একমুঠো ধুলোর চেয়ে খুব বেশি না
যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই শব্দগুলো:
'যা তালাশ করছ, তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

২২.
সারমেয় ব্যস্ততায় মেয়েটি
তার মালিকের যষ্ঠি এনে দেয়
চিঠি খোলার মুহূর্তে।

২৩.
আমরা সীমানা পার হই
মেঘের মতো আস্তে।
কেউ বহন করে না আমাদের
এগিয়ে চলি সামনে
বৃষ্টি বহন করি,
আর একটি স্বরাঘাত,
এবং অন্য জায়গার স্মৃতি।

২৪.
তার চোখে কী যে রোমাঞ্চকর অনুভূতি।
মেয়েটি বুঝতে পারে না কী বলে ছেলেটি:
মেয়েটি জাবর কাটে ছেলেটির কণ্ঠস্বর নিয়ে।
মেয়েটি দেখে তার মুখ সে কখনো চুমু খাবে না,
কাঁধে সে কখনো বহন করবে না,
হাতে মেয়েটি কখনো ধরবে না,
এবং মাটিতে তাদের ছায়া মিলিত হবে।

তিনটি কবিতা ।। মঈন মুনতাসীর

ফিরে এসো সুবর্ণরেখা

ফিরে এসো এই বাগদী জীবনে শোষকের রাঙা চোখে
শোকে বিহ্বল এ এক বিরান জনপদ
শ্বাপদ ঢুকেছে ঘরে, শুধু পচন গন্ধ আসে
পাশে প্রিয়তম নেই কেউ-কে ভাঙবে অত্যাচারীর হাত?
রাত কাটে নির্ঘুম, কখন দরজায় কড়া নাড়ে
ঘাড়ে ধরে স্টেনগান বলবে-ব্যাটা ছুট...!

বুটজুতা পায়ে আমাকে থেঁতলে দেবে আর
জামার ভেতর হাত দিয়ে টেনে নেবে বোনের সম্ভ্রম
আশ্রম যেনো এদেশ আজ শুধু মরা মানুষের

ঘাতক প্রিয় এ সিংহাসন
বাঙালি হারিয়েছে পথ চিরচেনা সাহসের
খুলে ফেলেছে সেই যুদ্ধ বসন

ফিরে এসো সুবর্ণরেখা, ধুয়ে দাও পাপিষ্ঠ সময়
ধুয়ে দাও হৃদয়ে জমে থাকা বরফ সমান ভয়!

মাতাল মাঝি, সঙ-খোয়াব এবং ও ওৎ-পাতা হাঙর

ঝড়ের কবলে পড়েছে আমাদের নৌকা
প্রবল বাতাস হেঁচকা টান দিয়ে তুলে এনেছে নোঙর
চারপাশে ওৎ-পেতেছে হাঙর, আর সামুদ্রিক দাঁতাল
আমাদের মাতাল মাঝি তখনো হুঁকোয় দিচ্ছে ফুঁ

কেউ রুকু কেউ সিজদায় কেউ ভগবান নাম জপে
কেউ ঈশ্বর পানে নিজেরে সপে মসীহের নামে বিহ্বল
এখন দল-বে-দল, ধর্ম- বর্ণ নেই আর ভেদাভেদ
যার নেই মেদ, মোটা যে জন-গলাগলি রহিম আর যদু
যেনো জাদু দেখার পর শিউরে উঠেছি

নিরন্তর ছুটেছি এক অনিবার্য পতনের দিকে
গরম শিকে নিজেদের মাংস বিঁধে হয়েছি শিক-কাবাব
মাতাল মাঝি, এবার তোমার ভাঙো সাধের সঙ-খোয়াব

আজরাঈলের সাথে সংলাপ, বুদ্ধিজীবীদের পেট কিংবা গণিকার যৌনাঙ্গ

আমি হয়তো মরে যাবো অকালে।
আজ সকালে-শহরের গণিকারা এসেছিলো আমার দরজায়!
আমি তখন মৃত্যুশয্যায়, ব্যস্ত আজরাঈলের সাথে সংলাপে,
সংক্ষুব্ধ প্রতিবাদের শাপে- আমার আটকে দিলো মুখ-
আমি বোঝাতে পারিনি তারে- কবি ঠিক গণিকার অসুখ!

সকল তত্ত্বকথার বেশ কিছু সময় আগে-
দেহ কিংবা আত্মার সংযোগে গণিকারা মুগ্ধ করে বটে,
আজও জন্মভূমির জিভ চেটে-পুটে জীবিকা বানিয়েছে যেসব বুদ্ধিজীবী-

আমি একুশ শতকের কবি অভিশাপ দিচ্ছি ছুঁড়ে,
গণিকার যৌনাঙ্গের মতো বুদ্ধিজীবীদের পেট যাক সংঘাতে পুড়ে!

ষড়ঋতু ।। মাসুম মুনাওয়ার

গ্রীষ্ম

হাতের তালু দেখতে দেখতে যেদিন সূর্য উঠেছিলো সেদিন প্রথমবার ফজরের নামাজ কাজা হয়। মা উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা ডালিম গাছটিকে গালি দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ডেমরা গাছ হইছে কত বছর। ফুল ফুটে, ছোট ছোট ডালিম হইয়াই ঝইরা যায়। গোবর দিলাম, পানি দিলাম কত। হইছেন উনি– ইয়া বড় ঝাপড়া মাথা। পোড়া কপালির জন্যে আজকে ফজরের নামাজটা পর্যন্ত কাজা হইলো। কই গো মাসুকের বাপ পাঞ্জেগানা শেষ হইলে এইটারে কাইটা ফালাও। এইটাতে আর ফল ধরবো না। এর লাইগ্যা ঘরে ইন্দুরে বাসা বানছে। যত্তসব যন্ত্রণা। নামাজ কাজা হওয়ার শোকে এইসব বিলাপ করতে করতে বকুলের দিন শুরু। তারপর স্বামী ও সন্তানদের জন্যে নাস্তা। নাস্তা শেষ হতে না হতেই দুপুরের আয়োজন। সকালের খাওয়া দাওয়া শেষ হয় বেলা এগারটায়। শোক কাটে না। হাঁটে আর দুখের কথা কয়। নারীদের জীবনে নেমে আসে কাজা নামাজের মতো দুঃখ। চলতে থাকে মৃত্যু অবধি। নামাজের জন্যে চলতে থাকে আবিল্লি। ডালিম গাছের সাথে নামাজ কাজা হওয়ার কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাই না আমি। যেমনি খুঁজে পাই না উন্নয়নের সাথে নারী মুক্তির বৈজ্ঞানিক সূত্র। অথচ আমাদের মায়েরা আবিল্লি করতে করতে স্বর্গে যান।

বর্ষা

ভারি বৃষ্টির ঢল যেইভাবে গিয়া জমিনে গড়ায়ে পড়ে ঠিক তেমনি গড়াইতে গড়াইতে একদিন কবিতা লিখতে শিখেছি। ঢলে নেমে যায় উঠানের মাটি। এই মাটিরে পলি কয় গ্রামের বাপ-চাচারা। বাড়ির সামনের জমিনকে বলে বিছরা। একদিন বিছরা থেকে কবিতা তুলে এনে মাকে রান্না করতে দিয়েছিলাম। মা বলেছিলেন, 'যা এই কবিতাটা তোর বাপরে দিয়ে আয়। তোর বাপ খুব খুশি হবে।' সেই থেকে মাকে নিয়ে কোনো কবিতা লিখতে পারিনি। মায়ের কোনো আলাদা বিষয় ছিলো না। মায়ের সব বিষয়ই আমার বাবা। বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি বলে মা খুশিতে দুধের সরটা আমাকেই দিতেন। মা বলতেন, তোর বাবাই আমার জীবন।

শরৎ

তিন বাপ চাচার আমরা মোট বারো জন ভাই বোন। বড় আপা ছাড়া দাদাকে আমরা কেউ দেখিনি। বড় চাচা দাদার গল্প করেন। দাদা ছিলেন জ্ঞানীগুণী ইজ্জতওয়ালা মানুষ। মানুষের দুঃখে ছিলেন দুঃখী। দাদা ছিলেন নৌকা বাইচের নাইয়্যা, ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার মালিক ও সোয়ারি। সুর করে পুঁথি পড়তেন। তাই শুনে গ্রামের মানুষ কাঁদত। দাদা ছিলেন গ্রামের মসজিদের ইমাম। বিমারে পড়লেই দাদার নিকট

ছুটে আসতো গ্রামের মানুষ। দাদা মন খুলে ঝাড়ফুঁক দিতেন। বড়চাচা গল্প করেন আর কান্দেন। বলেন– কত মানুষ ভালো হইছে বাজানের ফুঁ-তে। বাজানরে আমরা বাঁচাতে পারিনি। ভূতের সাথে কুস্তি করে দাদার কোমর ভেঙে গেছিলো। এরপরও বেঁচে ছিলেন অনেক দিন। দাদার নাম ছিলো মিজাজ আলী। মানুষ তারে ডাকতো মুন্সী বলে। মিজাজ আলী মুন্সী। আমারো খুব ইচ্ছে দৌড়ের একটা ঘোড়া কিনবো, বাইচের একটা নৌকা। তারপর বড় একটা এক্যুরিয়াম কিনে তাতে ছেড়ে দিবো নৌকাটা। ঘোড়াটাকে শোকেসের উপর রেখে দেবো। একদিন আমি আর দাদা গুনবো সেই সব দিনের হিসেব।

হেমন্ত

সাত আসমান। সাত জমিন। দশ দিক। পঞ্চইন্দ্রীয়। ষড় রিপু। এসব নানাবিধ গল্প শুনেছি চিনিফুফুর নিকট। দুই হাজার সাতে চিনিফুফু মারা যান। মা বলেন এসবের রহস্য চিনির মা ভালো জানে। চিনি ফুফু আমারে বড় করছেন। তার থেকেই অধিক আদর পেয়েছি। তাই মায়ের সাথে তেমন খাতির জমেনি আমার। তখন আমি নিউ টেনে। মিস্রিফুফুর বাড়ি বেড়াতে গেছি। মিস্রিফুফু ছিলেন চিনিফুফুর বড়। টানা সাত দিন ছিলাম। তারপর বাড়ি আসলাম। ঘরে পা দিতেই মা বললেন– 'চিনির মার কাছে যাবি না। কিচ্ছু দিলে খাবি না।' আমি ব্যাগটা রেখেই দৌড়ে গেলাম চিনিফুফুর ঘরে। ফুফু জায়নামাজে বসে তসবিহ পড়ছিলেন। আমাকে দেখে তসবিহ রেখে আঁচলের গিট খুলতে শুরু করলেন। আমি চোখ বন্ধ করে আছি। ফুফু কিছু একটা হাতে দিয়ে বললেন– 'আবু খায়ালা। কিচ্ছু অইতো না। তোর মারে কইছ না। তাইলে আমারে বকবো। তোর উত্তর বাড়ির দাদু দুইডা পিঠা দিছিলো। তোর জন্যে একটাই রাখছি। পিঠাডাতে যদিও ছাতা পইর‍্যা গেছে। মুইচ্চা খায়ালা। কিচ্ছু অইতো না।' আমি মারে না জানিয়েই পিঠাটা খেয়ে ছিলাম।

চিনি ফুফুরে আমরা ডাকতাম 'মিয়াশি হুয়াম্মা।' মিয়াশি তার শ্বশুর বাড়ি। আজ ফুফু নেই। বাড়ি গেলে ফুফুর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। পড়ি সূরা ইয়াসিন। 'ইয়াসিন। ওয়াল কুরআনিল হাকিম। ইন্নাকা লা মিনাল মুরসালিন। আলা সিরাতাম মুস্তাকিম.....' অনেক রহস্য অজানা রয়ে গেলো। প্রতিদিন ভোরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতেন ফুফু। হাত তুলে দোয়া করতেন। কি চাইতেন সূর্যের নিকট? অজানাই রয়ে গেলো তাবিজের গল্পগুলো।

শীত

অনেকদিন পর স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে দেখলাম বড় ফুফু ভিক্ষা করছেন। লোকজন ফুফুকে ভিক্ষা দিচ্ছে না। ফুফুর গা থেকে দুর্গন্ধ আসছে। ছেঁড়া পোশাক, নোংরা শরীর। পাশে আশার আগেই মানুষ তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বেঁচে থাকতে ফুফু আমারে খুব ভালোবাসতেন। স্বপ্নে আমাকে চিনতেই পারছেন না। ফোনটা বাজতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গেলো। বড় ফুফুর সাথে কোনো কথা হলো না।

ফুফুরা ধনী ছিলেন। ছিলেন ধার্মিক। মরণের পর ফুফু গরিব হয়ে গেলেন! নোংরা হয়ে গেলেন। আমার খুব আফসোস হচ্ছে! তার তো জান্নাত পাওয়ার কথা। প্রতিদিন ভোরে কোরআন পড়তেন। নামাজ কাজা হতে দেখিনি কখনো। কিন্তু তিনি ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষার থলি নিয়ে ঘুরছেন! আজব ব্যাপার।

বলতে পারেন স্বপ্ন নিয়ে গল্প লিখছি কেন! স্বপ্ন তো স্বপ্নই, তাই না! কিন্তু আমার স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই নয়। বুঝদার হওয়ার পর থেকে যত স্বপ্ন দেখেছি সবগুলোই সত্য হয়েছে। ভিক্ষার থলি হাতে হয়তো তিনি ঢাকার কোনো রাস্তায় ঘুরছেন। হয়ত আমি বা আমরা কেউ তাকে চিনতে পারছি না।

ভাবলাম বাবাকে ফোন করে গল্পটা বলতে হবে। নিশ্চয় বাবা জানবেন তার প্রিয় বোনের দুর্গতির কারণ। বাবা কষ্ট পাবেন বলে কল দিয়েও কিছুই বলা হলো না।

বসন্ত

পরিচয়। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন। তিন থেকে বহু। চক্রাকারে ঘুরছে মানুষ। এক থেকে বহু। একটা ফুলের সাথে আরেকটা ফুল– মালার মতো। পরিচয় থামে না তবু।

কাছ থেকে দেখেছি বিচ্ছেদের সুর। যার ভেতর চিন চিন করে বাজে রোদ। রোদ শুকিয়ে একটা পাঁপড়ির মতো গজায় শীতল তামাক। যার থেকে বেড়ে উঠে দৈহিক ছন্দ।

পৃথিবীটা জুড়ে আছে কাঁধের সাথে কাঁধ। ছায়ার সাথে ছায়া। মানুষের সাথে মানুষ। প্রাণের সাথে প্রাণ। হৃদয়ের সাথে হৃদয়। জগৎ একটা ফুলের মালা। হাজারো রঙের এক ফুল। আমরা সকলেই সকলের আপন। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পরিচয়।

একটি রাত ও অর্ধদিনের কাব্য

মাশুক শাহী

অঞ্জন সারাদিন আড্ডা মেরে, কাজের ধান্দায় থেকে রাতের বেলা বাসায় যাওয়ার জন্য আজিজ সুপার মার্কেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে হাঁটতে থাকে। কিছুদূর যাওয়ার পর যেই ডানদিকে মোড় নেবে ঠিক সেই সময় ছিঁচ্ কাঁদুনে বৃষ্টি শুরু হয়। অঞ্জনের মেজাজটা ভীষণভাবে খারাপ হতে থাকে। সে মোটেও এই ধরনের কিশোরী- কিশোরী বৃষ্টি পছন্দ করে না। তার পছন্দ মুষলধারে বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি শরীর-মন-প্রাণের সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। কিন্তু এই ধরনের ছিঁচ্ কাঁদুনে বৃষ্টি কিছুই তো পারে না বরং দেহ-মন-প্রাণে অনেক সময় সুক্ষ্ম কিন্তু দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া রেখে যায়। সে অভাবনীয় শৈল্পিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফেরে।

গেট দিয়ে ঢোকার পথেই হাতের প্রাকটিসের বন্ধুর সাথে দেখা হয়। বন্ধুর উপচেপড়া রঙ্গরস দেখে তার দেহের প্রতিক্রিয়ার ম্যারাথন মাথায় উঠে তাকে কোণঠাসা করে ফেলে। কোনো রকমে বন্ধুর বহুমাত্রিক কলা থেকে বাঁচিয়ে চারতলার চিলেকোঠার বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কতক্ষণ পড়েছিল সে জানে না। জানালা দিয়ে যখন ঠাণ্ডা বাতাস-পানির হিমেল শিহরণ তার শরীরে খেলে যায় তখন সে উঠে বসে। বসেই টের পায় তার ক্ষিদে লেগেছে। ঠিক তখনই দরজায় পড়ে টোকা। মনটা শান্তি-প্রশান্তি-বিভ্রান্তির মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে। এই টোকা কার, সে খুব ভালো করেই জানে। কালিদাসকে স্মরণ করে দরজা খোলে-দেখে বন্ধু দাঁড়িয়ে। কোনো কথা না বলে আঁচলের তলা থেকে ভাতের গামলা বের করে, প্লেটে পরিমাণ মতো ভাত-তরকারি রাখে। মমতা কার দিকে – বন্ধুর না ভাতের দিকে? ঝুঁকে পড়ে সে, বুঝতে পারে না। বন্ধু তাকে সময়ে অসময়ে বাঁচিয়ে রাখে। এইভাবে অঞ্জন যত বাঁচে তার চেয়ে বেশি করে সে মরে।

ছিঁচ্ কাঁদুনে বৃষ্টির সাথে বাউড়ি বাতাসের হিমেল নিবিড় ছোঁয়াছুঁয়ি তাকে টানতে থাকে দেহের দিকে-গ্রামের দিকে। দেহের মোড় ঘোরাবার জন্য সে সিগারেট ধরায়। সিগারেটের ধুয়া টানতে টানতে আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ে ভাবনায়। গ্রামে কোনক্রমেই খালি হাতে যাওয়া যাবে না। অনেক অনেক দিন সে বাড়িতে যায় না। বউয়ের জন্য না হোক সন্তান দু'টির জন্য কিছু নিতেই হবে। তাছাড়া অতি কম কথা বলা সবিতার সলতে জ্বালতে গেলেও সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। তারপরও এই শহরে যারা বাস করে-তাদের কাছে সকলের যেন কেমন একটা চাহিদা তৈরি হয়। কিন্তু এখানে থাকতে গেলে প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব-অনুভূতি-মানবিকতা হোঁচট খায়-মরে। এইসব কাকে বলবে সে? এতো সব ভাবতে ভাবতে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে দেহ-মন-প্রাণের মুক্তির জন্য সবিতার সান্নিধ্য চাই-ই-চাই!

অঞ্জন খুব সকালে উঠে প্যান্টের পকেটে হাত দেয়। দেখে দশ টাকা। সে যেখানে যাবে সেখানে গাড়িতেও দশ টাকা-রিক্সায় গেলেও দশ টাকা। সকালে পেটে কিছু পড়ারও দরকার। ঐ দিকে বৃষ্টি

অব্যাহত। এই অবস্থায় বন্ধু ও আজিজ সুপার মার্কেট তার কাছে সত্যি হয়ে দেখা দেয়। নিচে নেমে টুনটুনির ক্ষিপ্রতায় চারিদিকে তাকায়-কোথাও বন্ধু নেই। প্রায় প্রতিদিনই এই সময় তার দেখা পাওয়া যায়- অঞ্জন বুঝতে পারে গত রাতের নিরব প্রত্যাখ্যানের সরব ধাক্কায় ধরাশয়ী করার মেঠোপথে হাঁটছে বন্ধু। এক সত্যি সরে গেলেও আরেক সত্যির দিকে ম্রিয়মান বৃষ্টির মধ্যেই প্রচণ্ড গতিতে হাঁটতে থাকে-পৌঁছায়-দেখা পায় সহৃদয় এক ছোট ভাইয়ের। প্রথমে হোঁচট খায় পরক্ষণেই নিজের চিন্তায় ডুবে যায় – আসেন দাদা! সম্বোধনটির আন্তরিকতা, দৃঢ়তা মুহূর্তে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দোলাচালে ফেলে দেয়। অন্তরে ঢোকার পর যতক্ষণ নাস্তার অর্ডার না দেয় – ততক্ষণ পর্যন্ত দোলাচলের সে কি প্রচণ্ড তীব্রতা তা অনুভব করে সপ্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে – এই নাস্তা দে! শব্দটি কানে যাওয়া মাত্র সে প্রচণ্ডভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। নাস্তা করে আর মনে মনে হাসতে থাকে – বুকের গভীরে গানের সুরও উল্লাস করে।

"বন্ধু কি খবর বল, নিচে তোর দেখা পাইনি।"

আমি অন্তরে নাস্তা খাচ্ছি। নিজের রোমান্টিকতায় ঘাবড়ে যায়- নিজেকে সামলে নেয়।

প্রাপ্তির পরিমাণ উপচে পড়ায় সে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত হয়ে দশ টাকা নিয়ে সে গন্তব্যের দিকে ছন্দালয়ে হাঁটতে থাকে। সুদৃশ্য, মনোরম এই অফিসে সে কিছুটা বেমানান। তাকে দেখেই বন্ধু মাত্রাতিরিক্ত ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে আসে-নিবিড় হৃদ্যতায় ঘাড়ে হাত রাখে, এনে অফিসের ক্যান্টিনে বসায়। তার আন্তরিকতায় হৃদয়ে শর্টফিল্মের ঝিরিঝিরি নান্দনিকতা রিনিঝিনি সুর তোলে...। নতুন জামা পরে ছেলে-মেয়ে গ্রামীণ মেলায় যাচ্ছে। তাদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। তারা যত না গ্রামীণ মেলার খেলনা, মিষ্টি, লাভ্ডু, পুতুল নাচ দেখে তার চেয়ে বেশি নিজেদের জামা দেখে। আনন্দে উচ্ছ্বাসে মেলার মধ্যে তারা শুধু দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে...।

অনেক অনেক দিন পর স্বামীর কাছে উপরি পেয়ে কখন তাকে আলোড়িত করবে, ওর প্রতিটা কাজের ক্ষিপ্রতায় তার আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে। এই নান্দনিক ভাবনায় ডুবে সে ধরাশায়ী। এই দোস্ত চা খা। সে ফিরে আসে এই শহরে। চায়ের সাথে বন্ধু বেনসনও দেয়। ভালোই লাগে। Morning Shows the day.. দিনটা ভালোই যাবে! ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে আসে বন্ধু পরম হৃদ্যতায় পিঠে হাত রাখে- অঞ্জন আবারো দুলতে থাকে প্রাপ্তি–অপ্রাপ্তির দোলনায়–অত্যধিক প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। বুকের গভীর জল থেকে শুনতে পায়...কত দিন ওদের দেখিনি! ঠিক তখন-তখনই সে ওহি শুনতে পায় দোস্ত আরেকদিন আয়। সে শরতে ঝরতে থাকা-পড়তে থাকা পাতার মতো মরতে থাকে-পড়তে থাকে। কিছু একটা বলার জন্য বন্ধুর দিকে তাকায়-'দোস্ত অফিসে অনেক অনেক কাজ আছে; ব্যবস্থা হলেই আমিই তোর কাছে যাবো' বলেই তাকে নিচে রেখে বন্ধু উপরে উঠে যায়।

সবিতার একটা ছোট অনুরোধের আকুলতা তাকে বিপর্যস্ত করে। তোমার কিছু আনারও দরকার নেই, কিছু দেয়ারও দরকার নেই, মাঝে মাঝে একটু দয়া করে এসো। এসে, পাড়া পড়শীদের জানান দিও ওদের বাপ আছে-আমার স্বামী আছে। এই স্নিগ্ধ অনুরোধের তীব্র দহনে জ্বলতে জ্বলতে সে হাঁটতে শুরু করে। প্রেস ক্লাবের সামনে এসে তার একটু আরাম প্রিয় হওয়ার ইচ্ছে উঁকি মারে। পকেটে হাত দেয়-সেই দশ টাকা-ও বাড়েওনি কমেওনি, তবে বাড়ার নিশ্চয়তা না থাকুক কমে যাওয়ার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। দুপুরে যদি এক প্লেট ভাত ও এক বাটি ডালও খায়- তাও দশ টাকা-আবার এখানে থেকে শাহবাগ যেতেও দশ টাকা। নিঃস্বতর হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে হাঁটতেই থাকে, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে দিয়ে ফ্লাইওভারের নিচে এসে দো-টানায় পড়ে সে। সোজা ফুটপাত ধরে শিশুপার্ক হয়ে যাবে; না অন্য কোন ভাবে। পথশ্রম কমাতে সে ঢুকে পড়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, ভালোই লাগে প্রাকৃতিক সান্নিধ্যে। ভালো লাগাকে সঙ্গী করে ছবির হাঁটের গলিতে ঢুকতে যাবে ঠিক তখনই অসম্ভব সুন্দর শিশু কোলে অসম্ভব অপুষ্ট একটা মেয়ে তার সামনে দাঁড়ায়। ভাই, দুই দিন ও আর আমি কিছু খাইনি; বৃষ্টি লাথি মারলো পেটে আর পুলিশ লাথি মারে পেটে দেহে সব জায়গায়। মেয়েটির কান্নায় বৃষ্টি সরতে থাকে, শিশুটি হাসতে থাকে আর অঞ্জনও গলতে থাকে। 'হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান, দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান' জপ করতে করতে পকেটে হাত দিয়ে তুলে আনে অমূল্য দশ টাকা- টাকাটা দিয়েই অঞ্জন হাঁটতে থাকে।

টাকা নিয়ে মেয়েটি প্রথমে সন্তানকে আদর করতে থাকে। সামনে তাকায়, দেখে মানুষটি নেই-তার চোখ বিশ্ব সংসার তছনছ করে ফেলে – দেখতে পেয়েই কাছে আসে; 'স্যার কিছুই কইরবেন না'। অঞ্জন হাসে, দেখে সামান্য নিরাপত্তায় মেয়েটি কী অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেছে। কিছু না বলে ঘুড়ে দাঁড়ালে অঞ্জন শুনতে পায় 'স্যার একেবারে ফিরি ফিরি টাকাডা নিইতে ইচ্ছে কইরছে না'।

বৃষ্টির মুহুর্মুহু আমন্ত্রণ, ক্ষুধার সীমাহীন দৌড়াদৌড়ি আর তার সাথে মেয়েটির বিশ্বস্ত প্রেমজ আচরণে সে ভাসতে থাকে – ডুবতে থাকে। এমন তুমূল মানসিক অবস্থায় অঞ্জন আজিজ সুপার মার্কেটে আসে! পরিচিতজনরা তার জীবনমুখিনতা দেখে মুগ্ধ হয়; বিভিন্ন শৈল্পিক কথাবার্তায় ধন্য করে। অঞ্জনের চোখ একজন শুধু একজন মানুষ খোঁজে; যে তাকে এইবেলা ভাত খাওয়াবে!

টেলিফোন সাক্ষাৎকারে নোবেল জয়ী কাজুও ইশিগুরো

‘আমি আমার সেই মহানায়কদের কাতারে এসে দাঁড়ালাম যারা আসলেই মহোত্তম লেখক’

২০১৭ সালের ০৫ অক্টোবর বেলা না গড়াতেই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে নোবেল কমিটি। তারপরই নোবেল বিজেতা জাপানে বংশদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক কাজুও ইশিগুরোর দোর অবধি জনতার ঢল বাড়তে থাকে। তখন পর্যন্ত কাজুও ইশিগুরো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না ঘটনার সত্য-মিথ্যা। বেলা গড়ালে অ্যাডম স্মিথ, নোবেল মিডিয়ার চিফ সাইন্টিফিক অফিসারের সাথে মুঠোফোনে কথা বলেন কাজুও। তাদের কথপোকথন অনুবাদ করেছেন- দিদার মুহাম্মদ।

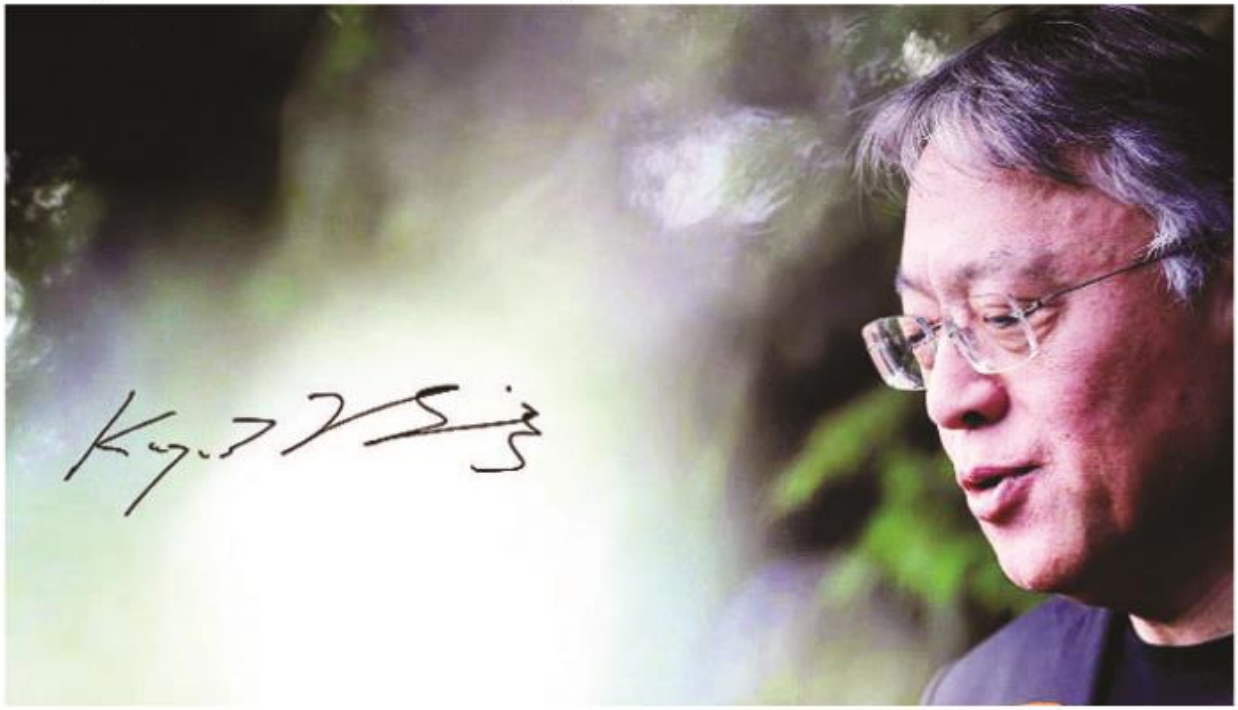

কাজুও ইশিগুরো: হায়, হ্যালো, মি. স্মিথ, কেমন আছেন?

অ্যাডাম স্মিথ: খুব ভালো। অনেক ধন্যবাদ, কল করেছেন, খুবই ভালো। নোবেল জয়ের জন্য আপনাকে অভিনন্দন।

কাজুও ইশিগুরো: হ্যাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আসলে দুঃখিত আপনার ফোন ধরতে পারিনি। এখানে আসলে হৈচৈ হুলুস্থুল কাণ্ড, কি বলব চমকে উঠেছি। হঠাৎই... প্রচুর সাংবাদিক এসে জড় হয়েছে, রাস্তায় তাদের লম্বা লাইন।

অ্যাডাম স্মিথ: বুঝতে পারছি আমিও। তাহলে তো আপনার দিনের শুরুটাই পুরোদস্তুর অপ্রত্যাশিতভাবে। আপনি কিভাবে সংবাদটি (নোবেল প্রাপ্তির) পেলেন?

কাজুও ইশিগুরো: হ্যাঁ, কিচেনে বসে এক বন্ধুকে একটা মেইল করছিলাম আর এমন সময় ফোন বেজে উঠল। আর অনবরত বেজেই যাচ্ছিল। আমার সাহিত্য সঙ্ঘ-সহচরেরা লাইভফিডে ঘোষণার সরাসরি অনুষ্ঠানে চোখ রাখছিল। আমি পাব-আমার মনে হয় না তারা এটা প্রত্যাশা করেছিল; তবে কে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে এ বছর তা শোনার জন্যই কেবল তারা অপেক্ষা করছিল। আর তাই আমি একের পর এক কল রিসিভ করেই যাচ্ছিলাম আর এটা বারবার বলছিলাম এটা নিশ্চয় ধাপ্পাবাজি, নয়তো ভুয়া সংবাদ হবে, তাছাড়া আর কি! কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাপারটার সত্যতা নিশ্চিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে যখন বিবিসি আমাকে কল করলো তখন আমি ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিলাম।

(বাকি অংশ পড়তে মূল ওয়েব পোর্টাল www. the report 24.com ভিজিট করুন।)

কিন্তু তখন পর্যন্ত আমি আসলে থামিনি। ব্যাপারটা কিছুটা মেরি সিলাস্টের মতো- কেউ ছিল না যেখানে সহসা সেখানে হৈচৈয়ের কাণ্ডটা শুরু হল বেলা ১১টা নাগাদ। এখন রাস্তায় জনতার সারি আমার ইন্টারভিউ নিতে।

অ্যাডাম স্মিথ: তো এখন কি কিছুটা হৈচৈ থামল?

কাজুও ইশিগুরো: নাহ্! না, মনে হয় যে লম্বা সময় লাগবে। আসলে আমি বলছিলাম, এটা যে অদ্ভুত এক বড় মাপের সম্মান, এমন সব বিষয়ে যেমনটা হয়ে থাকে আর কি। আমার মনে হয় না নোবেল পুরস্কারের চে' বড় সম্মানের পুরস্কার আপনি পাবেন। আমি যেটা বলতে পারি, মানে, একটা বিষয় যে, সুইডিশ একাডেমি সমস্ত রাজনৈতিক ধস্তাধস্তি আর বচসার উর্ধ্বে উঠে, মনে করি এটা সফলভাবে সম্পাদন করেছে- এটাই বড় কথা, এটাই সম্মানের। আমার ধারণা, সারা বিশ্বের মানুষের কাছে যার বিশুদ্ধতা সম্মানের সাথে গৃহিত হয় তেমন অল্পসংখ্যক মর্যাদাপূর্ণ বিষয়ের সাথে এটিও বিবেচিত হবে। আর তাই আমি মনে করি সুইডিশ একাডেমির এই প্রকৃত অবস্থানই এই পুরস্কার গ্রহণের সে মর্যাদাবোধের কারণ। এও মনে করি, সুইডিশ একাডেমি যে এই বিরাট অর্জন আজ অবধি সেই উচ্চতায় ধরে রাখতে পেরেছে জীবনের নানান চরাচরে সেটাই সম্মানের। উপর্যুপরি এ বিষয়টা আমার জন্য ভয়ঙ্কর সম্মানের কারণ- মানে বুঝতেই পারছেন, আমি আমার সেই মহানায়কদের কাতারে এসে দাঁড়ালাম যারা আসলেই মহোত্তম লেখক। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ লেখকরা এই পুরস্কার পেয়েছেন। আমি বলব কি জানেন, বব ডেলান যে কিনা আমার কাছে হিরো, সেই ১৩ বছর বয়স থেকেই, তাঁর এক বছর পর আমার এই প্রাপ্তি সত্যিই বিশাল। তিনি সম্ভবত আমার কাছে সবচে' বড় হিরো।

অ্যাডাম স্মিথ: তাহলে তো বেশ সোনায় সোহাগা হয়ে গেল।

কাজুও ইশিগুরো: তা তো বটে। আমি খুব ভাল করে বব ডেলানের রূপ ধরতে পারি, তবে এখন করতে পারবো না, হে... হে...।

অ্যাডাম স্মিথ: আপনার দয়া, নিশ্চয় আমার তা ভাল লাগতো। অন্তত যদি ডিসেম্বরে স্টকহোমে আসেন দয়া করে।

কাজুও ইশিগুরো: হে... হে... হ্যাঁ, সেটা চেষ্টা করতে পারি।

অ্যাডাম স্মিথ: অবশ্যই। ব্রিটেনে এখন মজার সময় যাচ্ছে। তবে জায়গাটা কি আপনার পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন কোন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে?

কাজুও ইশিগুরো: আমি মনে করি, করছে। আসলে আপনাকে ফোন দেবার ঠিক আগেই আমি একটা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির জন্য একটা স্টেটমেন্টের মতো লিখছিলাম, আর আমি ভাববার চেষ্টা করছিলাম তিন লাইনের মধ্যে কী বলা যায়। আর আমি মনে করি সময়টা আমার জন্য প্রাসঙ্গিক। কেননা আমি বোধ করি... আমার বয়স ৬৩ হতে চলল, আমার মনে পড়ে না আমরা কখনও এতটা অনিশ্চিত ছিলাম; পশ্চিম বিশ্বে আমাদের মূল্যবোধ নিয়ে। কি জানেন, মনে হচ্ছে, আমাদের মূল্যবোধের, আমাদের নেতৃত্বের একটা বিরাট অনিশ্চিত সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা। মানুষ নিরাপদ বোধ করে না। তাই আমার মনে হয় নোবেল পুরস্কারের মতো একটা বিষয় সারা বিশ্বে কোনভাবে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, সমুচিত মূল্যবোধে। আর এটাই পরিমিত আর এর নিরবচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। হুম।

অ্যাডাম স্মিথ: আমার ধারণা, আপনার এই সময়ের যত লেখা, তা কোনভাবে বিশ্বে আমাদের অবস্থানের প্রশ্নের; অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ক, বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে। সম্ভবত এই থিমটিই আপনি বেশি উন্মোচন করেছেন, আপনার কি ভাবনা?

কাজুও ইশিগুরো: হুম, তা বটে, আমি তা-ই ভাবি... যদি ছোট্ট করেও বলি, সম্ভবত আমাকে যে বিষয়গুলো সবসময় আকৃষ্ট করে তার একটা হল কিভাবে আমরা একই সাথে ক্ষুদ্র বিশ্বে ও বৃহৎ বিশ্বে বাস করছি আর

আমাদের একটি ব্যক্তিগত পরিসর আছে যেখানে আমাদের সমস্ত পূর্ণতা আর ভালবাসা খোঁজার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু এত বড় পৃথিবীর সাথে অনিবার্য বিচ্ছেদ, সেখানে ক্ষমতার রাজনীতি কিংবা নারকীয় জগৎই প্রতিষ্ঠা পায়। তাই ভাবি কি, আমি এগুলোতেই বেশি মগ্ন ছিলাম। একই সাথে ক্ষুদ্র ও বৃহৎবিশ্বে আমাদের বাস, কি জানেন, আমরা পারি না, একে অন্যকে ভুলতে।

অ্যাডাম স্মিথ: ধন্যবাদ, ভাল বলেছেন, এই কথাগুলো আমরা নিশ্চিয় অন্যদিন আলাপ করতে পারব।

কাজুও ইশিগুরো: হু... আচ্ছা।

অ্যাডাম স্মিথ: ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে ভাবতে হবে কিভাবে এই প্রেসের ভিড় উদ্ধার করবেন। একেবারে শেষ ভাবনা- এই যে আপনি পুরস্কার গ্রহণ করবেন, এই যে আপনার দিকে মনোযোগের জোয়ার, আপনার অনুভূতি কী?

কাজুও ইশিগুরো: ভাল কথা, আমি ভাবছি ইতিবাচকভাবে। মানে, এটা কিঞ্চিত অপ্রস্তুত হুলুস্থুল অবস্থা। যখন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম আরেকটা সাধারণ দিনের মতই এই দিনটা হবে না, আমার এ ব্যপারে কোন ধারণা ছিল না। আমি মনে করি এটা একটা বিশাল ব্যাপার যেখানে সাংবাদিক, গণমাধ্যম সবাই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার নিয়ে এত সিরিয়াস! আমি খুবই শঙ্কিত হবে সেদিন যেদিন কেউ নোবেল পুরস্কার নিচ্ছে আর কেউ তাতে আন্তরিক নয়। সেটাই ভাবাবার কেননা কিছু ভয়ংকর ব্যাপার বিশ্বে ঘটেছে।

অ্যাডাম স্মিথ: সাহিত্যকে উদযাপন করার দিনকে শুভদিন হতে হবে।

কাজুও ইশিগুরো: হুম। আর আমি ভাবি সাহিত্য একটা বিশাল বিষয় হতে পারে; এটা কখন-সখন খারাপের দিকেও যে ধাবিত করে। কি জানেন, আমি ভাবি সাহিত্য নোবেল পুরস্কারের মতো বিষয় বেঁচে থাকার চেষ্টা করে ভালোর দিকে ধাবিত করা নিশ্চিত করতে।

অ্যাডাম স্মিথ: অসাধারণ বলেছেন। হুম, আপনাকে আসলেই অনেক ধন্যবাদ। আর ডিসেম্বরে স্টকহোমে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য আমরা অপেক্ষা করবো।

কাজুও ইশিগুরো: হুম, তাই থাকুন। হুম, আপনার সাথে কথা বলে ভাল লাগল মি. স্মিথ।
অ্যাডাম স্মিথ: আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

কাজুও ইশিগুরো: ভাল থাকুন। বিদায়।

চিরশ্রী দেবনাথের কবিতা

অর্চ্চিষ্মান ও আয়ুমতী

এক

কদম ফুলের গায়ে লেগে থাকা নরম পশমের মতো,
রঙিন ওম ওম এক অতীত ঘিরে ঘিরে থাকে অর্চ্চিষ্মানকে
বিচ্ছেদের অতীত। এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয় গলার নিচের স্পর্শসমূহ।
ঠিক তখনি অশরীরির মতো তারা ওষ্ঠ চেপে ধরে,
যেন আদালতের রায়, যেন ছিঁড়ে ফেলা, কখনো না আসা সপ্তম ঋতুটি।
অর্চ্চিষ্মান পূনর্বার দিকচক্রবাল মুঠোতে নেয়, গলন্ত
ডিমের কুসুমের মতো আনত সূর্য।
চোখে সঙ্গীতের আসর শেষ হওয়ার রেশ, চশমার কাঁচে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আয়ুমতী।

দুই

আয়ুমতী নামটি দেবপ্রেরিত।
বিচ্ছেদের জল আয়ুমতীকে আরো হলুদ করেছে।
ত্বকে বৃক্ষের কথা, পাখির ফেলে যাওয়া বাসা, অস্ফুট খয়েরি ডিম।
আয়ুমতীর বিছানায় মধ্যবিত্ত গল্পগাঁছা।
বার বার ঘন চুলে চিরুনি হারিয়ে যায় তার
দেবতার থানে কথা রাখা আছে প্রেরকের
সুগন্ধি মাখা শেষে আয়ুমতী চলে যাবে পৃথিবীর কাছ থেকে

তিন

বিচ্ছেদের দীর্ঘ বিকেলে
ঘৃতকুমারী গাছের মতো সব অসুস্থতা
পেলব ঋণ জমা করেছে গাছের আঙুলে
সে আঙুল ছুঁয়ে দিতে চায় শেষরাতের অঙ্ককে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদী, নৌকায় ঘুমিয়ে থাকা জেলের ছেলেকে আদরের গান শোনায়।
আয়ুমতীও সে গান শোনে,
দেখে, জ্যোৎস্না নিয়ে খেলা করা বালিকার দল, ধুলোমাটির প্রেমপর্ব।
আয়ুস্মান একা কলহের তান তুলে সেতারের মূর্চ্ছনায়
এইসব কলহেরা বুকে বসে যাওয়া ঠাণ্ডা, অনির্নীত অসুখ

চার

এই অনির্নীত অসুখটি একটি অনির্ধারিত পরিচয়
অসহ সময়ের মাঙ্গলিক অধিবাস, রূপময়ী লোকগান
অর্চ্চিষ্মানের বাড়িয়ে দেওয়া লোভের বিন্দুতে আয়ুমতীর উদভ্রান্ত গলে যাওয়া,
বৃক্ষ মূলে আগুন পোহানো শীতরস
চিবুকের নিচে মেলে দেওয়া অভিমানের সাবধানী রঙ